আজব বাঘের আজগুবি

শৈলেন ঘোষ

Scanned with CamScanner

আমি আগে কখনও মানুষ দেখিনি। বলতে কী, মানুষের নাম-গন্ধও শুনিনি। প্রথম মানুষের নাম শুনে কেমন যেন একটা অদ্ভুত মজা লেগেছিল আমার। তুমি হলে নিশ্চয়ই হেসে ফেলতে। কিন্তু আমি বাঘ। আমায় কেউ হাসতে শেখায়নি। এমন কী, আমার ঠাকমাকেও আমি কোনদিন হাসতে দেখিনি।

এখন আমার ঠাকমা বুড়ি হয়ে গেছে। তা হলেও, এখনও যদি হাঁক পাড়ে, বন থরহরি। ইচ্ছে করলে এখনও এক থাবায় ইয়া পেল্লাই বুনো-মোষের ঘাড় লটকে দিতে পারে। বুনো-মোষকে পিঠে নিয়ে বন ডিঙিয়ে লাফ মেরে পালাতে পারে।

ঠাকমার যে অনেক বয়েস, তুমি অবশ্য তা দেখলে বুঝতে পারবে না। কারণ, এখনও একটিও দাঁত পড়েনি। চোখের তেজ একটুও কমেনি। থাবার নোখ এতটুকু ভোঁতা হয়নি। আমি হলপ করে বলতে পারি, তুমি দেখলে ভয় পেয়ে যাবে। আমি নিজেও তো দেখেছি, একটা বড় হরিণ ধরে এনে থাবার নোখ তার গায়ের ওপর একবার শুধু আলতো করে বুলিয়ে দিলো, অমনি হরিণের গায়ের চামড়া দু ফাঁক হয়ে ঝুলে পড়লো। কিন্তু আমি যদি ঠাকমার পাশে এসে দাঁড়াই, তখনই তোমার মনে হবে, ঠাকমার বয়েস হয়েছে। ঠাকমার পাশে আমাকে দেখলে তুমি ভাববে, বয়েসে আমি নেহাৎই নাবালক।

আসলে তাই। আমার কী আর এমন বয়েস! তা হলেও কিন্তু ঠাকমার চেয়ে আমি অনেক বেশি লাফালাফি করতে পারি। ঠাকমা তো একটু বেশি ছোটাছুটি করলে হাঁপিয়ে পড়ে। আমার ওসব নেই। চুপচাপ বসে থাকতে আমার ধাতে সয় না। তাছাড়া আমার নিজের চেহারার দিকে আমি যখনই তাকাই, আমার তখনই বুক ফুলিয়ে হাঁটতে ইচ্ছে করে। আমার গায়ে রঙের বাহার কী! ডোরা ডোরা দাগগুলো ঝকঝক করছে। থাবার নোখগুলো চকচক করছে। আমার নিজেরই নিজেকে এত ভালো লাগে!

আমি আমার ঠাকমার কাছেই প্রথম মানুষের কথা শুনি।

Scanned with CamScanner

আমার ঠাকমা অনেকবার মানুষ দেখেছে। আমি শুনেছি, আমাদের মত মানুষের চারটে পা নয়। পায়ে থাবাও নেই। মানুষের পায়ের বদলে দুটো হাত। দু পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে হাঁটা-ছোটা, চলা-ফেরা করতে মানুষের কোন অসুবিধেই হয় না। একথা শুনে আমার খুব অবাক লেগেছিল। আমি নিজেও যে দুপায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটা-চলা করতে চেষ্টা করিনি, তা নয়। কিন্তু একেবারে অসম্ভব! তবে আমাদের এখানে ভাল্লুকগুলো পারে। বাচ্চা ছেলেকে বুকে নিয়ে মা-ভাল্লুক যখন হাঁটে, তখন বেড়ে দেখতে লাগে! ভাল্লুকের অমন হাঁটা দেখেই আমি মানুষেরও একটা মোটামুটি চেহারা ধারণা করে নিয়েছিলুম। অবশ্য মানুষের গায়ে যে ভাল্লুক অথবা আমাদের মত লোম নেই, সেটা ঠাকমা আমায় আগেই বলেছিল। ঠাকমার ধারণা মানুষের মাথাটা দেহের একেবারে ওপরে বলে ওদের বুদ্ধি খুব। তবে সাহস নিয়ে অনেক তক্ক-বিতক্ক আছে। কেউ বলে, মানুষ ভীষণ সাহসী, আবার কেউ কেউ বলে, ফুঃ! ওদের হাতে বন্দুক থাকে বলে ওদের এত সাহস। একা-একা লড়ে যাক! তবে ঠাকমা বলে, বাঘকে মানুষ যমের মত ভয় করে। বাঘের সামনে বন্দুক ছাড়া এক পা এগুতে পারে না। কিন্তু ভাল্লুক বলো, কী হাতি বলো, মানুষ ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে সহজেই পোষ মানায়। শুনেছি রাস্তায় রাস্তায় ভাল্লুকের নাচ দেখিয়ে বেড়ায়।

সত্যি বলছি, প্রথম যেদিন নাচের কথা শুনি, মানে ভাল্লুক নাচে এই কথাটা শুনলুম, সেদিন আমি একেবারে থ। প্রথমতো নাচ ব্যাপারটা কী, নাচলে সাপের পাঁচ পা দেখা যায় কিনা, কিম্বা নাচ জিনিষটা চোখে দেখার অথবা পেটে খাওয়ার, তা আমি একদমই জানতুম না। তারপর মশাই, নাচের মানেটা যখন আমার মাথায় ঢুকলো, যখন জানলুম, নাচ মানে পা ঠুকে ঠুকে ধেই ধেই করা আর ধেই ধেই করে কোমর বেঁকিয়ে ঘাড় দুলিয়ে, লাফ মারা, তখন সত্যিই আমি তাজ্জব বনে গিয়েছিলুম। কারণ, ভাল্লু-কের চেহারাটা এমন বিদ্‌ঘুটে হোক্কাই চমচমের মত যে, সে কোমর বেঁকিয়ে নাচবে, এ আমি ভাবতেই পারি না। আমি ভাবতে পারি চাই নাই পারি, ভাল্লুক নাচে, নাচছে, নাচবে!

সুতরাং, একদিন আমার মনে হলো, ভাল্লুক যদি নাচতে পারে তা হলে আমিও পারি। আর তাই একদিন নিজঝুম চাঁদনি রাতে আমার খুব নাচতে ইচ্ছে করছিল। জানো তো, আমি বাঘ বলে আমার ফ্যাচাং-এর ঠেলা কত! নাচতে হলে আমায় লুকিয়ে-ছাপিয়ে নাচতে হবে। কেননা, কেউ দেখে ফেললে বদনামের একশেষ! বাঘ আবার চ্যাংড়ার মত নাচবে কী! যার হুঙ্কারে বনের পিলে ফাটবার গোত্তর, সে ধেই ধেই করে নাচছে এটা কারো নজরে পড়লে মুখ দেখাবার যো থাকবে! কাজেই আমার নাচ আমি ছাড়া আর যাতে কেউ না দেখতে পায়, সেইজন্যে বনের যেদিকটা সবচেয়ে নিরিবিলি সেইখানেই চার-পা তুলে ধাই-ধপাধপ সুরু করে দিলুম। সুখের কথা, আমার নাচ দেখবার জন্যে টিকিট নিয়ে মারামারি কাটাকাটি লেগে যায়নি। কারণ, কেউ জানতেই পারেনি আমি এখানে নাচের আসর বসিয়েছি। কিন্তু দুঃখের কথা, চাঁদনি রাতে আকাশ উপচে সেদিন জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়লেও, নাচ ব্যাপারটা আমার নিজের কাছে নেহাৎ-ই একটা ফালতু ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, এ-সব উদ্ভুট্টি কাণ্ডকারখানা ভাল্লুক-টাল্লুকদেরই সাজে! ওসব কম্ম বাঘের জন্যে নয়। ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! বাঘ কোমর বেঁকিয়ে নাচবে কী! বাঘ কী যাত্রাপার্টির সন্ত!

সৌভাগ্যই বলো আর দুর্ভাগ্যই বলো, আমি আগে বন্দুক জিনিষটা কী, জানতুমই না। বন্দুক নাকি একটা সাংঘাতিক যন্তর। ঠাকমা বলে, বন্দুকের গুলি গায়ে লাগলে রক্ষে নেই। অজানতে বন্দুকের সামনা-সামনি পড়লে নির্ঘাৎ মরণ! আমার মাকে নাকি আমি সেই বন্দুকের গুলিতেই হারিয়েছি! শুনি, আমার মা ছিল মানুষ-খেকো!

আমি তখন খুব ছোট। জ্ঞান-গম্যি বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। তাই মা যখন আমায় ছেড়ে চলে গেল, তখনকার কথা আমার আবছা আবছা মনে আছে। আমি মায়ের যেটুকু আদর পেয়েছি, তা-ও আমার স্পষ্ট মনে নেই। ঠাকমা-ই আমাকে বড় করে তুলেছে।

মানুষ-খেকো কথাটা শুনলেই আমার কেমন গা ঘিনঘিন করে। সত্যি বলতে কী, বাঘে মানুষ খায়, এ-কথাটা আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কী আসে-যায়। মা পঞ্চাশটার ওপর মানুষ মেরেছিল। মেরে মেরে মানুষের রক্ত খেয়েছিল। দুর্দান্ত সাহস ছিল আমার মায়ের। মা রাত্তিরবেলা বন ডিঙিয়ে মানুষ-পাড়ায় চলে যেতো। মানুষের ঘর থেকে চুপিসাড়ে ষণ্ডা ষণ্ডা মানুষ ধরে নিয়ে আসতো। শুনেছি, মানুষ শিকার করা নাকি সবচেয়ে সোজা। অবশ্য আমার ঠাকমা মাকে অনেকবার বারণ করেছিল। বলেছিল, "বেশি বাহাদুরি করা ঠিক না।" কিন্তু আমার ঠাকমার কথা মা শোনেইনি। তাছাড়া শুনেছি নাকি, মানুষের রক্ত পেটে পড়লে তার লোভ ছাড়া দায়! মানুষের রক্ত নাকি খুব মিষ্টি! একবার স্বাদ পেলে আর রক্ষে নেই! নেশা ধরে যায়!

মা সাধ করে মানুষ-খেকো হয়নি। মানুষের ওপর মায়ের ছিল ভীষণ রাগ। অবশ্য এর জন্যে আমি মাকে খুব দোষ দিই না। দোষ যদি দিতে হয়, মানুষকেই দেব। যদি বললে কেন, তাহলে বলি, আমার বাবাকে মানুষে ধরে নিয়ে গেছে! নিশ্চয়ই জানো, বাঘ ধরা ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কিন্তু ওই যে বলেছি, ঠাকমা বলে, মানুষ দারুণ চালাক।

বুদ্ধিতে বাবাও কম যেতো না। কিন্তু আমার অমন বুদ্ধি-মান বাবাকেও যে মানুষগুলো অমন বোকা বানিয়ে দেবে, এ-কথাটা বাবা কেন, কেউ-ই ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেনি।

বাবার ছিল দারুণ স্বাস্থ্য, নিটোল। আর খুব চমৎকার গড়ন। গর্জন করতে করতে বন কাঁপিয়ে বাবা যখন হাঁটতো, তখন দেখলে মনে হতো, সত্যিই বাবা বনের রাজা। বাবা কাউকে কেয়ারই করতো না। কেয়ার করার দরকারই ছিল না। কারণ, বাবার মূর্তি দেখলে ধারে-কাছে ঘেঁসে এমন সাধ্যি কার!

কিন্তু এই কেয়ার না করাটাই যে কাল হয়ে দাঁড়াবে, আগে-ভাগে সেকথা আর কে জানতে পারবে? কে বুঝবে, বনের রাজাকে ধরবার জন্যে বনের আনাচে ফন্দি এঁটে মানুষ ঘাপটি মেরে বসে আছে! সত্যিই সেদিন এক মস্ত হার হয়ে গেল আমাদের। বাবা মানুষের হাতে বন্দী হয়ে গেল।

রোজই তো বাবা সন্ধের ঝোঁকে শিকার করতে বেরয়। সেদিনও বেরিয়েছিল। সেদিন হয়তো বাবার ইচ্ছে ছিল হরিণ ধরবে। সত্যি বলতে কী, হরিণ ধরা খুব শক্ত। নজরে পড়লে এমন ছুটবে, শত চেষ্টাতেও তাদের ধরা যাবে না। এক যদি ঐ লম্বা শিংগুলো লতা-পাতায় আটকে না যায়। কিন্তু হরিণ ধরতে গিয়ে বনের অন্ধকারে বাবা যে একটি নধরকান্তি ভেড়া দেখতে পাবে, এটা একেবারেই আচমকা ব্যাপার। সেটি যে মানুষই চালাকি করে ছেড়ে রেখেছিল, তা বাবা একদম বুঝতে পারেনি। তাই ভেড়াটাকে দেখতে পেয়েই বাবা টিপ করে মেরেছে লাফ। অমনি সঙ্গে সঙ্গে, দুম—দুম! আওয়াজটা বন্দুকের নয়, বোমার। প্রচণ্ড আওয়াজ। বাবা সাংঘাতিক চমকে উঠেছে। ভেড়াটাকে ছেড়ে মার ছুট! ছুটবে কোন দিকে? যেদিকে ছুটবে সেদিক থেকেই অমনি শ' শ' মানুষ ক্যানেস্তারা, ঘণ্টা পিটিয়ে খেদা লাগালে। বাবার তো চক্ষুচড়কগাছ। সামনে ছুটতে গিয়ে থমকে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েই, পেছনে ছুটতে গেল। অমনি পেছন থেকেও শ' শ' মানুষ চিলের মত চেঁচিয়ে উঠে বাবাকে তেড়ে এলো। বাবা আকাশ-পাতাল কিচ্ছু ভেবে না পেয়ে, চোখ-কান বুজে মারল লাফ। ব্যস! বাবা যে একটা শুকনো পাতা চাপা দেওয়া গর্তের মধ্যে লাফ মেরে পড়বে, সে কি আর জানতো? সত্যি একেবারে হুমড়ি খেয়ে একটা গর্তের

মধ্যে মুখ গুঁজরে বাবা পড়ে গেল! কী গভীর গর্তটা! সেখান থেকে শত লাফালাফি করেও বাবা উঠতে পারলো না। আকাশ ফাটিয়ে তর্জন-গর্জন করেও কোন লাভ হলো না। বাবা এখন মানুষের ফাঁদে পড়েছে। বাবাকে ধরবে বলে মানুষ গর্ত কেটে, তার ভেতর একটি লোহার খাঁচার ফাঁদ তৈরি করে রেখেছিল। তারা জানতো, আমার বাবা শিকার ধরতে এদিকেই আসবে। তারপর শুকনো পাতা দিয়ে সাজানো এই ফাঁদে পড়ে বন্দী হবে।

বাবা বন্দী হয়েছিল। ওই লোহার খাঁচায় বন্দী করে বাবাকে মানুষের দল ধরে নিয়ে গেল। তারপর যে বাবার কী হলো, কেউ জানে না।

আর এইতেই আমার মায়ের মাথা গেল বিগড়ে। যাবারই কথা। বাবার জন্যে আমার মা এমন মুষড়ে পড়লো যে, মনে হলো মা বুঝি আর বাঁচবেই না। কিচ্ছু খেতো না, কোথাও যেতো না। শুধু পড়ে পড়ে গুমরোতো। আমার ঠাকমারও মনে ভীষণ লেগেছিল। ঠাকমা অত দুঃখেও কিন্তু ভেঙে পড়েনি। মাকে বলতো, "বউ, ওঠ। খেয়ে নে। অমন উপোষ করে থাকলে মরবি যে। নিজের কী দশা হয়েছে একবার চেয়ে দেখেছিস? ছেলেটাকে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে!"

ছেলেটা মানে, আমি। আগেই তো বলেছি, আমি তখন একদম ছোট। আর সেইজন্যেই বাবার কী হলো, না হলো সে-সব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কথা নয়। আমি নিজের খেয়ালেই মত্ত। ছুটি, লাফাই, খেলা করি। বাবাকে দেখতে না পেয়ে, হঠাৎ হঠাৎ যখন বাবার কথা আমার মনে পড়ে যায়, জিগ্যেস করলেই ঠাকমা বলে, "তোর বাবা বে' বাড়ি গেছে নেমন্তন্ন খেতে।" আমি শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে উত্তর দিতুম, "ও।" কিন্তু দেখতুম, আমার কথা শুনে আর আমার মুখের দিকে চেয়ে, মায়ের চোখ ছলছল করছে। আমি ভাবতুম, মায়ের বোধহয় ব্যামো হয়েছে। পেট কামড়াচ্ছে, তাই কাঁদছে। পেট কামড়ালে আমিও কাঁদি। সে তো এক-একদিন। কিন্তু মা-তো রোজই পড়ে পড়ে কাঁদে। তাহলে কী মায়ের ভারী অসুখ করলো!

অনেকদিন কেটে গেল। সত্যিই আর বাবা ফিরে এল না। ফিরে যে আসবে না, এ-তো জানা কথা। তবু তো বলা যায় না। অঘটন ঘটেও তো যেতে পারে। কিন্তু না, কিছুই ঘটলো না। এটা ভাবাও তো মিথ্যে যে, লোহার খাঁচা ভেঙে বাবা পালিয়ে আসবে! এ-তো সবাই জানে, মানুষের খপ্পর থেকে নিস্তার পাওয়া মানে, যমের দুয়ার থেকে ফিরে আসা। অত সোজা! সোজা নয় ঠিকই, কিন্তু কেউ আশা কী ছাড়ে?

মায়ের আশা যখন সত্যি সত্যি ভেঙে গেল, বাবা যখন সত্যিই ফিরলো না, সেই তখন থেকেই আমার মা মানুষের ওপর খেপে গেল ভয়ংকর রকম। মানুষ দেখলেই তাকে মারো। তার টুঁটি টিপে রক্ত শুষে খেয়ে ফেলো, এই হলো মায়ের গোঁ! আর এই করতে করতেই মা হয়ে উঠেছিল পাকা মানুষ-খেকো। মানুষ মারার জন্যে মা জঙ্গল ডিঙিয়ে চুপিসাড়ে পাড়ি দিয়েছে লোকালয়ে। যাকে পেরেছে খতম করেছে। নিজের গায়ের জ্বালা মিটিয়েছে। শেষে এমন স্বভাব হয়ে গেল, যেন মানুষ মারাটা কিছুই নয়। হাতের টুসকি।

বেশি গোঁয়ার্তুমি করাটা যে মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়, এ-কথা মাকে কে বোঝাবে? মার খেতে খেতে মানুষও যে চুপটি করে হাত গুটিয়ে হরিনাম জপছে না, এতো আর মা জানতো না। তাকে মারবার জন্যে মানুষও যে মতলব আঁটতে পারে, এটা মগজে ঢোকেইনি মায়ের। তাই মায়ের সাহস যেন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে গেল। শেষে একদিন দিন-দুপুরেই এক ভয়ানক কাণ্ড করে বসলো মা।

আমাদের বনটা পেরুলেই যে বস্তীটা নজরে পড়ে, সেখানে যে অনেক লোকজন, তা নয়। দু-চার ঘর। তা হলেও, আমি বলবো, দিনের বেলা সেখানে বাঘ-ভাল্লুকের যাওয়া মোটেই উচিত নয়। আমার মা কিন্তু তাই করে বসলো। হুট করে ভর দুপুরেই সেখানে হাজির হলো। জায়গাটা মোটেই খোলামেলা নয়। কারণ, বস্তীটা বনের একেবারে কোলে। এদিকে বনটা অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু গাছ-গাছালি, ঝোপ-ঝাড় যথেষ্ট আছে। দেখলে মনে হবে, ঘন জঙ্গলের গায়ে গা ঠেকিয়ে বস্তীটা দাঁড়িয়ে আছে। তখন কাঠ-ফাটা রোদ্দুর। একটা ছোট ছেলে এই নির্জন দুপুরে ঘোড়াকে খাওয়াবে বলে, বনের ধারে ঘাস কাটতে এসেছিল। ছেলেটা নাকি রোজই আসে। রোজই নাকি তার সঙ্গে কেউ না কেউ সঙ্গী থাকে। মা কদিন ধরেই লক্ষ্য করেছে। কিন্তু শিকার করার তেমন যুতসই সুযোগ আসেনি। এ-কথাটা তো ঠিক, রাগ দেখিয়ে হুট করে কিছু করতে গেলে বিপদ সবারই হতে পারে। সুতরাং, মা ঝোপের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে থাকে আর সুযোগ খোঁজে।

আজ সুযোগ মিলে গেল। কে জানে কেন, ছেলেটার সঙ্গে আজ কোন সঙ্গী নেই। আজ ছেলেটা একাই এসেছে। মা যেদিক থেকে ছেলেটাকে লক্ষ্য করছিল, সেদিকে পেছন করেই ছেলেটা ঘাস কাটছে। সেইতক্কে মা ছেলেটার ঘাড়ে এক মেরেছে লাফ! লাফ মেরেই থাবার বাড়ি এক ঝটকা। ছেলেটার মুখ দিয়ে রা পর্যন্ত বেরুলো না। সেখানেই লুটিয়ে পড়ল। মা সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাকে মুখ দিয়ে চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল একটা ঝোপের মধ্যে। সেখানে লুকিয়ে রাখলে। কারণ, মা জানে এখন এটাকে খাওয়া যাবে না। এক্ষুনি চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে। ছেলেটার খোঁজ করতে দলে দলে লোক এসে পড়বে। এখন এখানে থাকলে বিপদও হতে পারে। অন্ধকার রাত্তির হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সময়। তাই রাত্তিরে আসার মতলব এঁটে মা ছেলেটাকে লুকিয়ে রেখে ওখান থেকে সরে পড়লো। মা নিশ্চিত জানতো, যে-জায়গায় তার শিকার লুকিয়ে রেখেছে, সে-জায়গার হদিশ আর কাউকে পেতে হচ্ছে না।

কিন্তু চালে ভুল করে বসলো মা। মানুষের সঙ্গে চালাকি করতে গিয়ে অজানতে নিজের ফাঁদ নিজেই ফেঁদে বসলো। অন্য-অন্যবার মা কাউকে শিকার করে সঙ্গে সঙ্গে শিকারটাকে ঘাড়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। তাই মাটিতে কোন চিহ্ন থাকে না। এবার কিন্তু মা তার শিকারকে ঘাড়ে করে নিয়ে গেল না। দিন-দুপুরে বলে কেউ পাছে দেখে ফেলে, তাই মা তড়িঘড়ি ছেলেটাকে মাটিতে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে গেল। তার ফলে হলো কী, টানা-হ্যাঁচড়ার দাগ আর রক্ত সারাটা পথে ছড়িয়ে রইলো। এটা কিন্তু মা জানতেই পারলো না। তাই নিশুতি রাতে মা যখন ছেলেটাকে খাবে বলে সেখানে হাজির হয়েছে, তখন একদম টের পায়নি, ওই হ্যাঁচড়ানি আর রক্তের দাগের হদিশ পেয়ে তাকে মারবার জন্যে গাছের ওপর একটা মানুষ বন্দুক উঁচিয়ে বসে আছে। মা কী ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেরেছিল, তার দিন শেষ হয়ে এসেছে! তাই হুমড়ি খেয়ে বসে বসে নিশ্চিন্তে তার শিকারের মাংস খাচ্ছিল। তারপর—

গুড়ুম

একেবারে মায়ের মাথার ভেতর বন্দুকের গুলি ঢুকে গেল। মা গর্জন করতে পেরেছিল একবারটি। তারপর ছিটকে পড়লো ক হাত দূরে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। আর একবার গুলি ছুটলো, মায়ের ছটফটানি নিস্তেজ হয়ে গেল। তারপর যে কী হলো কেউ জানে না।

এ-সব তো আমি বড় হয়ে ঠাকমার কাছে শুনেছি। কিন্তু তোমাকে তো আমি আগেই বলেছি, মা যখন আমায় ছেড়ে চলে যায়, তখন আমি খুব ছোট। তাই সেই ছোটবেলায়, সেদিন মাকে ফিরতে না দেখে আমি ভেবেছি, মা-ও বুঝি বাবার মত বে' বাড়ি

গেছে নেমন্তন্ন খেতে। সে যাই হোক, মা-ও বাবার মত আর কোনদিন ফেরেনি। তখন আমি মনে মনে অবাক হয়ে ভেবেছিলুম, বে' বাড়ি সে কেমন বাড়ি যে, সেখানে কেউ একবার গেলে আর ফেরে না। বে' বাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়ার ব্যাপারটা যে কী, সেটি জানার জন্যে তাই আমার মনটা সব সময়েই ছুকছুক করতো। যখনই ফাঁক পেতুম ব্যাপারটা জানার জন্যে তখনই ঠাকমাকে ঘ্যানঘ্যান করে জ্বালাতন করতুম। ঠাকমা কিন্তু কিছুতেই বলতো না। আমিও ছাড়তুম না। শেষে একদিন আমার জ্বালায় তিতিবিরক্ত হয়ে, এইসা ধমক দিয়েছিল যে, সেইদিন থেকে বে' বাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়ার ব্যাপারটা আমার মগজ থেকে একদম হাওয়া। আমি অবশ্য বড় হয়ে, অনেকদিন পরে, বে' বাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়ার মানেটা বুঝেছিলুম। বুঝেছিলুম, ছোটবেলায় আমাকে ভোলাবার জন্যেই ঠাকমা ওই কথাটি পেড়েছিল।

বয়েস হলে সকলের অনেক জ্ঞান বাড়ে। অনেক কিছু জানতে পারে। আমার ঠাকমাও তাই। বাঘ হলে কী হবে, ঠাকমার মানুষের ঘরের নাড়ি-নক্ষত্র সব জানা ছিল। ঠাকমা জানতো, মানুষ যেমন গাঁয়ে-গঞ্জে থাকে, তেমনি থাকে শহর-পাড়ায়। গাঁয়ে যেমন মাটির বাড়ি, শহরে তেমনি কোঠা বাড়ি। গাঁয়ে লোকজন নাম-মাত্র, শহরে অগুনতি, অসংখ্য। এ-সব কথা কতদিন আমায় ঠাকমা গল্প করেছে। ঠাকমার মুখেই শুনেছি, মানুষের বিয়ে হয় খুব ধুমধাম করে। বর টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে আসে কনেকে। অনেক সব মন্তর-টন্তর পড়া হয়। শাঁখ বাজে। মেয়েরা মুখে হুলু-হুলু করে কী রকম ডাক দেয়। বিস্তর লোক জমায়েৎ হয়ে লুচি, মাংস, রসগোল্লা সব খায়; এইটাকেই নেমন্তন্ন খাওয়া বলে। আমি অবশ্য কাঁচা মাংস অনেক খেয়েছি, কিন্তু রান্না করা মাংস কখনও খাইনি। তাই ওর স্বাদ-গন্ধ আমার জানা নেই। শুনেছি লুচির তেমন কোন স্বাদ নেই। কিন্তু রসগোল্লার স্বাদ নাকি সাংঘাতিক। রস ভর্তি বড় বড় গামলায় যখন রসগোল্লা ভাসে, বসে দেখলে নোলার জল সামলানো দায়!

শেষ-মেষ বাবা মা দুজনকেই যখন আমি হারালুম, তখন ঠাকমার যে কী হলো, আমাকে একদম কাছ-ছাড়া হতে দিত না। সব সময়ে নজরে নজরে রাখতো। আমাকে যেন আরও বেশি করে আদর করতো। কারণ, বাপ-মা-মরা ছেলে তো! ভালো ভালো শিকার ধরে এনে ঠাকমা আমায় খাওয়াতো। কোনদিন হরিণ, কোনদিন মোষের গর্দান আবার কোন-কোনদিন ভাল্লুক-ছানা। একদিন একটা বুনোশুয়োর এনেছিল। বেড়ে খেতে কিন্তু!

কিন্তু তাই বলে তো চিরটাকাল ছোট্ট সেজে আমি থাকতে পারি না। ঠাকমা আমায় শিকার ধরে এনে আমার মুখে তুলে দেবে, আর আমি খাব, এ কেমন কথা! সুতরাং আমিও যখন একটু একটু করে বড় হয়ে উঠলুম, আমারও তখন মনে মনে ইচ্ছে হতো, আমি নিজে নিজে শিকার ধরবো। পরের মুখ চেয়ে থাকতে তখন কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকতো! লজ্জাও করতো! ঠাকমাও জানতো, ছেলেটাকে চিরদিন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ালে অভ্যেস খারাপ হয়ে যাবে। কুটো নেড়ে কিচ্ছু করতে চাইবে না। কুঁড়ের মত শুয়ে-বসে ঝিমুবে। তাই ঠাকমা একদিন আমায় বললে, "চ, শিকার করতে শিখবি চ।" সত্যি বলছি, কথাটা শুনে আমার পা থেকে মাথা অবধি আনন্দে শিউরে উঠলো।

আকাশ থেকে চাঁদটি পেড়ে এনে কে যেন আমার হাতে তুলে দিলে। এখন আমার বয়েসটা এমন যে, সব সময় মনে হয় একটা কিছু করি। এমন একটা কিছু, যাতে বেশ মারামারি আছে। বেশ সাহস দেখানো যায়। কিম্বা বুক কাঁপানো উত্তেজনা। তাই ঠাকমার কথায় রাজিতো হলুমই, এমন কী ঠাকমার কথা মুখ থেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে মারলুম লাফ। ঠাকমা চেঁচালে, "একা একা যাসনি।" কিন্তু কে শুনছে কার কথা!

অবশ্য ঠাকমা আমায় একা যেতে দিলো না। দু লাফে আমায় ধরে ফেললে। রেগে ভীষণ ধমক দিলে। বললে, "অমন করলে আর কোনদিন আনবো না। বিপদে পড়লে তখন দেখবে কে?"

আসলে, বিপদেই তো আমি পড়তে চাই। বিপদে না পড়লে মজা কী?! কিন্তু এটাও তো ঠিক, মজা পেতে গিয়ে প্রাণও যেতে পারে। মিথ্যে বলবো না, গা-ছমছম জঙ্গলে ঢুকে একটু একটু ভয়ও পাচ্ছে। যতই হোক প্রথম দিন তো! তাই আমি আর অবাধ্যের মতো বেশি হুটোপাটি না করে, শান্ত শিষ্টের মতো ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল ডিঙিয়ে ঠাকমার সঙ্গে শিকার খুঁজতে লাগলুম।

একটা নির্জন জায়গার কাছে এসে ঠাকমা দাঁড়ালো। আমায় ইসারা করলে, আমিও দাঁড়িয়ে পড়লুম। আমি ফিস-ফিসিয়ে জিগ্যেস করলুম, "দাঁড়ালে কেন?"

ঠাকমা চাপা-গলায় বললে, "এখানে চুপটি করে বসে থাক!"

আমি গলার স্বর আরও নিচু করে, ঠাকমার গায়ে গা ঘেঁসিয়ে জিগ্যেস করলুম, "বসবো কেন?"

ঠাকমা উত্তর দিলে, "এক্ষুনি শিকার আসবে।"

কথাটা শুনে আমার চোখ দুটো যদিও তক্ষুনি চনমন করে চমকে সামনে তাকিয়েছিল, কিন্তু শিকারের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কে জানে, ঠাকমা কেমন করে বুঝলো শিকার আসবে! সে যাই হোক, ঠাকমার কথা শুনে আমি বসে পড়লুম ঝোপের মধ্যে। ঠাকমাও উপুড় হয়ে আমার পাশে বসে পড়লো।

বুনো-গাছের আড়াল দিয়ে এ-জায়গাটা এমন ঘেরা যে, শত চেষ্টা করেও কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। কিন্তু আমরা ঝোপের মধ্যে দিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে সব ঠাওর করতে পারছি। আমার সামনে একটা নালা। নালাটা দিয়ে তিরতির করে জল বয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, দু-একটা মাছও জলে ভাসছে। আমার মাথার ওপর একটা মস্ত বড় ঝাঁকড়া-গাছ। কী গাছ, জানি না। ওপর দিকে চাইতেই দেখি, একটা গিরগিটি গাল ফুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ টকাস টকাস করে এমন ডেকে উঠলো, মনে হলো, আমায় যেন ঠাট্টা করছে। ভেতরে ভেতরে আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল! কিন্তু রাগ দেখিয়ে তো কোন লাভ নেই। কেননা, গিরগিটিটাকে ধরা আমার সাধ্যি নয়। কোনখান দিয়ে পালিয়ে গিয়ে যে গর্তে ঢুকে পড়বে, দেখতেই পাবো না। তার চেয়ে ওকে ডাকতে দাও। ডাকতে ডাকতে মুখ ব্যথা হয়ে গেলে আপনিই থামবে।

এই দেখো, ঠাকমা ফুস! ঘুমিয়ে পড়েছে। বয়েস হয়ে গেলে এই এক জ্বালা। একটু ঠাণ্ডা-জিরোন জায়গা পেলেই গা এলিয়ে নাক ডাকাবে। থাক, ঘুমুক। ঠাকমাকে দেখে বড্ড দুঃখু হয়। ছেলে-বউ সব ছিল। সবাইকে হারিয়ে মনের মধ্যে দুঃখু নিয়েই বেঁচে আছে। এখন বড্ড একা। বুড়ো বয়সে অমন দু-দুটো আঘাত পেয়ে আরও বুড়িয়ে গেছে ঠাকমা। আমিই এক ভরসা, এই যা।

যেন কী একটা নড়ে উঠলো! চকিতে আমার চোখ দুটো সামনে চেয়ে থির হয়ে গেল। একটা হনুমান। মাটির ওপর তিড়িং তিড়িং লাফ মেরে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে নালাটার সামনে এসে মুখ ঠেকিয়ে জল খাচ্ছে। আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো। আমিও নিঃসাড়ে ঝোপের জঙ্গল ঠেলে বেরিয়ে এলুম। এখান থেকে দুটো লাফ মারলেই আমি হনুমানটার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। আমি মারলুম লাফ। কিন্তু সব গড়বড় হয়ে গেল। আমি নিশানা ঠিক করতে পারি নি, না, হনুমানটা বুঝতে পেরে একটু সরে গেল, তা আমি জানি না। তাই আমি হনুমানটার ঘাড়ে না পড়ে সিধে ওই নালাটার

Scanned with CamScanner

জলের ভেতর ঝপাং করে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। ততক্ষণে হনুমানটা এক লাফে গাছের ওপর। গাছের ওপর উঠে, এমন বিচ্ছিরি ক্যাঁচ-ম্যাঁচ করে চিৎকার সুরু করে দিলে যে, আমি বুঝতে পারলুম না, সে আমার এই দুর্দশা দেখে ঠাট্টা করে হাসছে, না ভয় পেয়েছে। আমি হুড়মুড়িয়ে জল থেকে উঠে পড়েছি। উঠে দেখি, হনুমানের হল্লা শুনে ঠাকমাও ছুটে এসেছে! আমার কাণ্ডকারখানা দেখে ঠাকমা আমায় একটুও বকাবকি করলো না। উল্টে যে-গাছটায় হনুমানটা লাফিয়ে লাফিয়ে চিৎকার করছিল, সেই গাছের দিকে লাফ মারলে। ধরা শক্ত। কারণ, অত ওপরে লাফ মেরে কী ওঠা যায়! গাছে ওঠবার জন্যেই যে ঠাকমা লাফ দিচ্ছিল, তা নয়। যতদূর মনে হচ্ছে, ওকে ভয় দেখাবার জন্যে। ঠাকমার মাথার মধ্যে কী ছিল আমি জানি না। কিন্তু ঠাকমাকে লাফাতে দেখে হনুমানটা যে ভীষণ ভয় পেয়েছে, সেটা আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি। ঠাকমা শেষবার যখন গলায় বিকট গর্জন করে লাফ মারলো, আমি তাজ্জব বনে গেলুম দেখে, হনুমানটা গাছ ফস্কে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল! আর দেখতে নেই, আমি ঝড়ের মত লাফিয়ে উঠে হনুমানের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আমার জীবনে আমি সব-প্রথম নিজের মুখে শিকার ধরলুম। যদিও হনুমান, শিকার তো!

তারপরও দু-চারবার আমি ঠাকমার সঙ্গেই শিকারে গেছি। ক্রমে একটু একটু করে আমার সাহস বাড়তে লাগল। তারপর আমি একদিন একাই শিকার ধরে আনলুম।

একা-একা শিকার ধরতে এখন আমার কোন ভয়ই হয় না। যতই একা-একা শিকার ধরতে লাগলুম, ততই সাহসে আমার বুকটা ফুলে ফুলে উঠতো। মনে হতো আমার সামনে এখন কে দাঁড়াবে! এই জঙ্গলটা এখন আমার কথায় উঠবে বসবে। এখন আমি এই জঙ্গলের রাজা। আমার সামনে সব মুড়ি-মুড়কি!

আমার ঠাকমা ধীরে ধীরে বয়েসের ভারে নুয়ে পড়ছে। ঠাকমা এখন আর তেমন খাটতে পারে না। তেমন লাফাতে পারে না। সারাদিন ঘুমের ঘোরে ঢুলুনি দেবে। ভারি কষ্ট লাগে। আমি নিজেও আর চাই না, ঠাকমা আমার জন্যে কষ্ট করুক। এখন তো আমি ছোট্টটি নই যে, সব সময় পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করবো! কিম্বা ঠাকমার কোলে বসে আদর খাবো! আমি চাই, ঠাকমা এখন চুপচাপ শুয়ে থাকুক। যে ঠাকমা একদিন শিকার ধরে এনে আমায় খাওয়াতো, আজ সেই ঠাকমাকে আমি শিকার ধরে এনে খাওয়াই। আমার যে কী আনন্দ লাগে! আমার বাবা-মা আমার জন্যে কতটুকু করতে পেরেছে! কিছু করার আগেই তো তারা হারিয়ে গেল। যা কিছু করেছে সে তো আমার ঠাকমাই। তাই ঠাকমার জন্যে কিছু করতে পারলে আনন্দ হবে না?

একদিন ঠাকমা আমায় বললে, "এখন তো আমি বুড়ো হয়ে গেলুম। আমি তো এবার মরবো। আমি মরে গেলে তুই একা থাকতে পারবি তো?"

আমি উত্তর দিয়েছিলুম, "তুমি মরবে কী ঠাকমা! আমি তোমায় মরতে দেব না। আমি যতদিন বাঁচবো, তোমায় ততদিন বাঁচিয়ে রাখবো।"

ঠাকমা বলেছিল, "তোর তো এখন উঠতি বয়েস, তাই বয়েস বাড়লে বেঁচে থাকার যে কী জ্বালা, তুই তা বুঝবি না।"

ঠাকমার কথা শুনে আমার মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। ঠাকমাকে জিগ্যেস করলুম, "তোমার জ্বালা কিসের ঠাকমা? আমি কি তোমায় কষ্ট দিচ্ছি?"

ঠাকমা উত্তর দিলে, "না রে। এতদিন তোকে নিয়ে আমার বুক ভরে ছিল। তোকে চোখে চোখে রাখতুম, খাওয়াতুম,

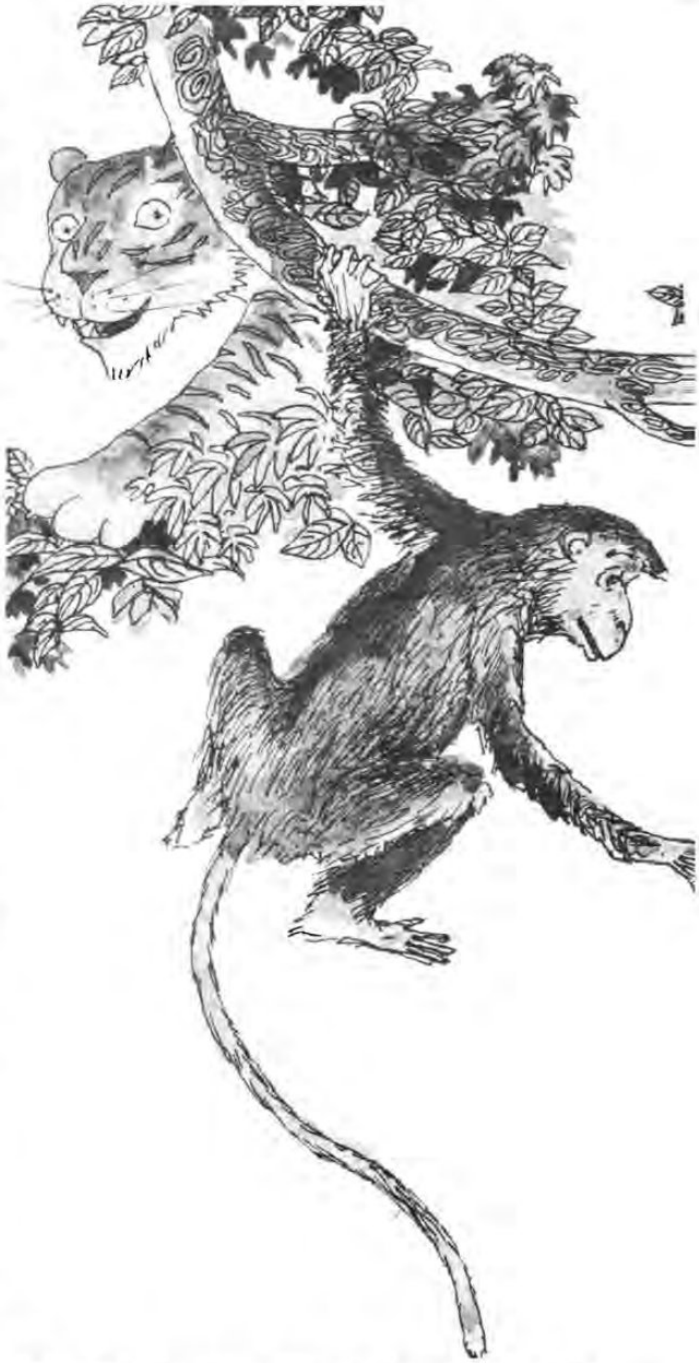

সাধ-আহ্লাদ করতুম। তাতে যে আমার কী আনন্দ ছিল, সে-কথা তোকে আমি বোঝাতে পারবো না। আজ তুই বড় হয়েছিস। নিজে নিজে সব পারিস। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমার দিনও শেষ হয়ে এসেছে। তাই দিন-রাত তোর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকি।"

আমি বললুম, "ঠাকমা, একদিন যে আমিও তোমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতুম?"

ঠাকমা উত্তর দিলে, "দুটোর মধ্যে তফাৎ আছেরে, বাছা।"

"কী তফাৎ ঠাকমা?"

ঠাকমা বললে, "আমি কষ্ট করেছি তোকে বড় করে তোলবার জন্যে। আর তুই কষ্ট করছিস যার জন্যে, সে তো আর বেশিদিন বাঁচবে না। এখন আর আমার দাম কি বল? আমার জন্যে তোর কষ্ট করে লাভ কী?"

আমি বললুম, "একি কথা বলছ ঠাকমা? তুমি না থাকলে

Scanned with CamScanner

আমায় এত আদর-যত্নে কে বড় করে তুলতো? তোমার জন্যে কষ্ট করতে আমার ভালো লাগে।"

আমার কথা শুনে ঠাকমার চোখ দুটো কেমন ছলছল করে উঠেছিল। আমার মনের ভেতরটাও কেমন দুঃখে ভার হয়ে গেছলো।

আমাদের এখানে একপাল হাতি এসেছে। খবর পেয়েছি, পালে কটা হাতির বাচ্চাও আছে। নিজেদের চেহারাগুলো অমনি বিরাট বিরাট বলে, হাতিগুলো যেন কারোর তোয়াক্কাই করে না। ওদের দাপটে সবাই জুজু। খবরটা কানে আসা অবধি আমার পা থেকে মাথা অবধি রাগে জ্বলছে। আস্পর্ধা তো কম নয়! আমি থাকতে হাতির দল বনে দেমাক দেখিয়ে ঘুরে বেড়াবে আর আমাকে তা সহ্য করতে হবে! সুতরাং আমি মনে মনে ঠিক করলুম, হাতিগুলোকে শায়েস্তা করতে হবে।

কথাটা বলা সহজ, কিন্তু করাটা সহজ নয়। কারণ, গায়ের জোরে হাতিও কম যায় না। তবে হাতির চেহারাটা যেমন গদাইলস্করের মত, বুদ্ধিটাও যদি তেমনি হতো, তাহলে রক্ষে ছিল না। কিন্তু এ কথাও বলি না, ওদের বুদ্ধি একেবারে নেই। এমন বুদ্ধি, দল বেঁধে যখন হাঁটবে, তখন বাচ্চাগুলোকে মাঝখানে আগলে নিয়ে হাঁটবে। মতলবটা হচ্ছে, বাচ্চাকে বাঘে না ছোঁ মেরে নিয়ে পালায়। সত্যি কথা বলতে, একটা পুরুষ্টু হাতিকে পিঠে নিয়ে পালাবার ক্ষমতা বাঘের নেই। তবে চেষ্টা করলে একটা বাচ্চাকে পিঠে ফেলে পালানো যায়।

আমায় অবশ্য ঠাকমা বলেছিল, "কক্ষনো একা হাতির সঙ্গে লাগতে যাস না। ওদের গায়ে ভীষণ জোর। একবার যদি শুঁড় দিয়ে ধরে ফেলে তাহলে নির্ঘাৎ পায়ে টিপে মেরে ফেলবে।"

অতই সোজা! আমাকে শুঁড়ে ধরে টিপে মারবে! আমি বাঘের ব্যাটা! তাই আমি যখন প্রথম ওদের দেখি, ইচ্ছে করেই নিজেকে আড়ালে রেখেছিলুম। একটা ঝোপের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ওদের কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিলুম। আমার ধান্ধা ছিল, ওরা একটু অন্যমনস্ক হলেই একটা বাচ্চার পিঠে লাফিয়ে পড়বো! কিন্তু তারপরেই কথাটা ভালো করে ভেবে, নিজেকে এমন ছোট বলে মনে হলো। ছিঃ! ছিঃ! বাঘের মনে এ-রকম কাপুরুষের মতো ভাবনা! আমি না সাহসী, শক্তিমান। না, না, চোরের মতো নয়। লড়তে যদি হয়, মরদের মতো সামনা-সামনি লড়বো। বাচ্চা মেরে হাত গন্ধ করার মধ্যে কোনই বাহাদুরি নেই!

কিন্তু ওদের দেখে তো এই বাহাদুর বাঘের চক্ষু স্থির। লড়াই করবো কী! ওরা এমনভাবে দল বেঁধে আছে, লড়াই তো দূরের কথা, কাছেই ঘেঁসা যাবে না। এক হতে পারে, আচমকা যদি কোন একটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। তাতেও এক বিপদ। কারণ, একটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, আর দশটা একসঙ্গে তেড়ে আসবে। তখন সাংঘাতিক বিপদ। তাই ভাবলুম, দলটাকে তছনছ করে দিই। এই ভেবে, আমি ঝোপের আড়াল থেকে ভয়ংকর হুংকার ছাড়লুম। কিন্তু বলবো কী, আমার হুংকার শুনে ওই হাতির পাল এতটুকু ভয় পেলো না, ছুটেও পালালো না। উল্টে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর শুঁড় উঁচিয়ে ডাক ছাড়লো। যেন বলতে চাইলো, "আয় একবার দেখি!"

বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে এখন হুট করে এখান থেকে বেরিয়ে না পড়া। আমি আবার প্রচণ্ড গর্জন করে উঠলুম। ওই হাতির পালের যেটা সর্দার ছিল, সে ঘুরে দাঁড়ালো। কুঁৎ কুঁতে চোখ দুটো এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে খুঁজতে লাগলো। তারপর ক'পা এগিয়ে এল। মজা কী, সর্দার এগিয়ে এলো বটে, কিন্তু সর্দারের সঙ্গে আর কেউ এলো না। আর সকলে বাচ্চা আর বাচ্চার মায়েদের আগলে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি মনে মনে চাইছি সর্দার আরও একটু এগিয়ে আসুক। ওর চলার বহর আর হাবভাব দেখে বেশ বুঝতে পারছি, আমি কোথায় লুকিয়ে আছি ও তার হদিশই করতে পারছে না। ও যখন আমার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে, আমি মেরেছি লাফ। একেবারে সর্দার হাতিটার সামনে। আমায় দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে এতটুকু ভড়কে গেল না হাতিটা। ওই বিরাট দেহটা নিয়ে হাতি আমায় তীরের মত তেড়ে এলো। তার গলা দিয়ে বিকট চিৎকার বেরিয়ে এলো। আমিও গর্জে উঠলুম। বন কেঁপে উঠলো। আমি লাফিয়ে ক'পা পিছিয়ে এলুম। হাতিটা ঝোপ-জঙ্গল মাড়িয়ে-পিষে আমার দিকে এগিয়ে এলো। আমি হাতির পেছন দিকে লাফ মেরে পালালুম। হাতিটা চক্ষের নিমেষে ছলকে উঠে ওই মস্ত দেহটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লো। ইচ্ছে ছিল আমার, এই পেছন দিক থেকে হাতির পিঠের ওপর লাফিয়ে পড়বো। কিন্তু হঠাৎ দেখি, হাতির দু নম্বর সর্দারটা কোত্থেকে ছুটে এসে একেবারে আমার সামনে। তখনই আমার মনে হলো, এইরে পেছনে লাফ মেরে তো আমি ভুল করেছি। আমায় যে ঘিরে ফেলছে। এখন যদি আর দুটো হাতি ছুটে এসে ডাইনে-বাঁয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাহলে তো নির্ঘাৎ মরণ! কিন্তু আমি বাঘ। আমার ভয় পেলে তো চলবে না। মুখখানা বিচ্ছিরি রকম খিঁকিয়ে উঠে, এক ধমক মেরেছি আমি দু নম্বর সর্দারকে। দু নম্বর সর্দার তো! তাই বয়েস কম। সেইজন্যে একটু বেশি দুর্দান্ত। আমার ধমকে ও ভয় পাবে কেন? আমার দিকে গোঁৎ গোঁৎ করে তেড়ে এলো। মুখের শুঁড়টা লকলক করে উঠছে-নামছে। দাঁত দুটো সাদা ঝকঝকে ছুঁচালো। একবার পেটে ঘুঁসিয়ে দিলেই শেষ। আমি আগু পিছু কিছু না-ভেবে দু নম্বর সর্দারের মাথার ওপর মেরেছি এক লাফ। ডান কানটা খাবলে নিয়ে, মাথায় টেনে দিয়েছি থাবার এক ঝটকা। আমি দেখতে পেলুম দু নম্বর সর্দারের মাথাটা ফেটে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো। আমিও বন কাঁপিয়ে হাঁক দিচ্ছি, হাতিও চিল্লাচ্ছে। শুঁড়টা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে আঁক-পাঁক করছে। আমি জানতুম আর একবার যদি ওর মাথার খুলির ওপর আর একটা থাবা মারতে পারি, তবে হাতির কম্ম শেষ। কিন্তু সর্দার হাতিটা আমায় তা করতে দিলো না। নিমেষের মধ্যে ছুটে এসেছে। বিদ্যুৎ চমকে ওঠার মত আচমকা শুঁড় দিয়ে খপাৎ করে আমায় চেপে ধরেছে। আমি বুঝে নিলুম এবার আমার শেষ। কী প্রচণ্ড শক্তি এই শুঁড়টার। আমায় যখন টিপে ধরলো, মনে হলো, আমার বুকের পাঁজরগুলো বুঝি সব গুঁড়িয়ে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমারও শক্তি বা কিসে কম! যখন সর্দার হাতিটা শুঁড় দিয়ে চেপে ধরে আমায় নিচে নামাচ্ছে আমায় পা দিয়ে টিপে মারবে বলে, সে তখন জানতো না তার শুঁড়টাকে আমি কামড়ে ধরবার চেষ্টা করছি। ও যদি আমার গলাটা শুঁড় দিয়ে চেপে ধরতো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি দম ফেটে মরতুম। কিন্তু হুড়োমুড়িতে সে আমার বুক আর পিঠটা জড়িয়ে ধরেছে। আমার মুখের নাগালে আমি ওর শুঁড়টা পেয়ে গেছি। আমার দাঁতে যত জোর ছিল, সব জোর দিয়ে কামড়ে দিয়েছি। আমি জানি না, আমার কামড়ের জোরে ওর শুঁড়টা ছিঁড়ে পড়ে গেল কিনা। কিন্তু সর্দারটা প্রচণ্ড চিৎকার করে আমায় ছেড়ে দিলো। আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। বুকের প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে আমি লাফ দিলুম। তারপর আর কিছু জানি না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে কাতরাতে লাগলুম। ঠাকমার কাছে যখন ফিরলুম, দেখলুম, তখনও ঠাকমা ঘুমোয়নি। আমার জন্যে বসে আছে। আমি কাতরাতে কাতরাতে ঠাকমার কোলের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। ঠাকমা ব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করলে, "কী হয়েছে রে?"

আমি কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে উত্তর দিলুম, "হাতির সঙ্গে লড়াই।"

কদিন পরে শরীরটা যখন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো, যখন মনে হলো, নতুন করে হাতির সঙ্গে আমি আবার লড়াই করতে পারি, তখন আমি আবার বনের রাজার মত গর্জন করতে করতে বন কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। কিন্তু হাতির সঙ্গে লড়াই করার পর ব্যাপারটা চারিদিকে যে হাওয়ার মত ছড়িয়ে পড়েছে, এ-কথা আমি জানতেই পারিনি। এমন কী মানুষের কানেও পৌঁছে গেছে। আর সেই নিয়ে মানুষের কাছে এটা একটা মস্ত খবর। বনে-জঙ্গলে বাঘের সঙ্গে হাতির লড়াই হবে, এ আর এমন কী নতুন কথা! বাঘ, সিংগি, গণ্ডার নানান জন্তুর সঙ্গে খুটখাট হামেশাই লেগে আছে। আর এইটাই তো জঙ্গলের জীবন। তা না হলে তো জন্তুরা জঙ্গল ছেড়ে কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকের মত ঘোড়ার গাড়ি চেপে শহর করতে বেরুতো!

খবরটা মানুষের কানে পৌঁছুবার পর থেকে তারা যে আমার পিছু নিয়েছে, আমায় খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে এ-কথা আমি আর কেমন করে জানবো? কারণ, আমি তো থাকি জঙ্গলে। ওরা ভেতরে ভেতরে গুজগুজ করে কী শলা-পরামর্শ করছে, আমার কানে তো সেই খবর পৌঁছে দেবার কেউ নেই। আমার অজানতে আমি তাদের কাছে একটা দুর্দান্ত বাঘ। তারা হয়তো ভেবেছিল, এ-বাঘটা হাতির সঙ্গে যখন লড়াই করেছে, তখন হুট করে কোনদিন না কোনদিন মানুষ-পাড়ায় এসে মানুষেরও তো ক্ষতি করতে পারে!

সত্যি বলছি, মানুষের কোন ক্ষতি করবো, এ ভাবনা আমার মাথায় এতদিন পর্যন্ত একদম ঢোকেনি। তবে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার মা আর বাবার দুর্দশার কথা মাঝে মাঝে আমার মনটাকে ভীষণ দুঃখে ভরিয়ে তুলতো। তখন মনে হতো, মানুষকে পাই তো ছিঁড়ে খাই। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোন সুযোগ আসেনি। আর আসবে কিনা তাও জানি না।

আজ আমার ভাগ্যটা ভালো বলতে হবে। কেন না, দিন-দুপুরে হঠাৎ একটা শিকার মিলে গেল। বেশ বড়-সড় একটা বুনো-শুয়োর। আপাতত আমার পেটে জায়গা নেই। একদম খিদে নেই। তাই এখন এটাকে মুখে করে তুলে নিয়ে ওই ঝোপটার মধ্যে লুকিয়ে রাখাই ঠিক করলুম। তারপর সন্ধে নাগাদ যখন খিদে পাবে, তখন রসিয়ে খাওয়া যাবে। ঠাকমার জন্যে কাল একটা হরিণ শিকার করে দিয়েছি। সেটা খেয়ে শেষ করতে পারেনি। আজও চলে যাবে। আমি শুয়োরটাই খাব।

মুশকিল হচ্ছে কী, শিকার মেরে তুমি যদি বনের মধ্যে খোলা-মেলা ফেলে রেখে যাও, ভেবে থাকো পরে এসে খাবে, তাহলেই ভুল করে বসবে। কারণ, তুমি চোখের আড়াল হলেই, পাঁচ-ভূতে তোমার খাবার সাবড়িয়ে, তোমার জন্যে পেসাদ রেখে যাবে খটখটে হাড় কখানি। তাই আমি এটাকে একটা ঘুপচি-ঝোপে লুকিয়ে রেখে বড় বড় শুকনো-পাতা দিয়ে ঢেকে রেখে গেছলুম।

কিন্তু রাত্তিরে শিকারের কাছে ফিরে যে দৃশ্য দেখলুম, তাতে তো আমার চক্ষু ছানাবড়া। দেখি কী, একটি হৃষ্টপুষ্ট ভাল্লুক বেশ বহাল তবিয়তে আমার শিকার দিয়ে পেটপুজো করছে। আমি যে এসেছি, সেটি পর্যন্ত বাছাধন টের পাননি। আর যদি টের পেয়েও থাকেন, তাহলে বলবো আমাকে সে গ্রাহ্যই করেনি। আমার মাথা গেল বিগড়ে। রেগেমেগে এমন হুংকার ছেড়েছি যে, বেচারা ভাল্লুকের পিলে বুঝি ফট হয়ে যায়! তবে ভাল্লুকটাও কম যায় না! আমার দাবড়ি খেয়ে পালাবে কোথায়, তা না, ডাক ছেড়ে রুখে দাঁড়ালো। আচ্ছা একগুঁয়ে তো! তবে রে! তোর ভাল্লুকের নিকুচি করেছে! আমি ঝাঁপিয়ে পড়লুম ভাল্লুকের ঘাড়ে। ভাল্লুকটাও ছাড়বার পাত্তর নয়। ঠ্যাং দিয়ে সে-ও আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর যা লেগে যা ঝটাপটি! প্রচণ্ড লড়াই! ভাল্লুকও চেঁচায়, আমিও গর্জন করি। ধামসা-ধামসি, খামচা-খামচি, মাটির ওপর গড়াগড়ি।

চিৎকার, গর্জন আর ধামসা-ধামসির আওয়াজটা এমন সাংঘাতিক হয়েছিল যে সেই আওয়াজ আমার ঠাকমার কানেও পৌঁছে গেছে। বুড়ি ঠাকমা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে। সেদিন দেখলুম এই বয়েসেও ঠাকমার কী তেজ! ছুটে এসে, মুখে কোন কথা না বলে ঠাকমাও ভাল্লুকটার ওপর লাফিয়ে পড়েছে। আমি বলবো কী, ঠাকমা যেই লাফিয়েছে অমনি সঙ্গে সঙ্গে

গুড়ুম, গুড়ুম

গাছের ওপর থেকে মানুষ গুলি করেছে। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অন্তত দশ হাত দূরে আমার ঠাকমা ছিটকে পড়লো। ঠাকমার বুকে গুলি বিঁধেছে! আমি একদম হতভম্ব! কী করবো, না করবো সেই বুদ্ধিটুকু মাথায় আসতে না আসতে আবার আওয়াজ

গুড়ুম

কী হলো জানি না। শুধু মনে হলো, আমার গায়ের ওপর কে যেন আগুনের গোলা ছুঁড়ে মারলে। আমি ছিটকে গেলুম। প্রচণ্ড গর্জন করে, লাফ মেরে পালাতে গিয়ে ভীষণ জোরে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেলুম। পড়ে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠেছি। আবার গুলির শব্দ

গুড়ুম

আমাকেই তাক করে মেরেছে। এবার তাক ফস্কে গেল। লাগেনি। লাগলো গিয়ে গাছের গায়ে। সেই তক্কে ওখান থেকে আর একটা লাফ মেরে আমি ছুট দিলুম। অন্ধকার রাত্তির তাই রক্ষে!

ছুটতে ছুটতে আমার মনে হচ্ছে, হয়তো এখনকার মত আমি বেঁচে আছি। কিন্তু পরে কী হবে, জানি না। কী প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে আমার পিঠে। বুঝতে পারছি, গুলিটা পিঠেই এসে লেগেছে। গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে পিঠ দিয়ে। গুলি আমার পিঠে লাগলো বলে, আমি এখনও ছুটতে পারছি। কিন্তু গুলি ঠাকমার বুকে বিঁধলো, তাই ঠাকমা আর উঠতে পারলো না। ছিঃ! ছিঃ! শেষ বয়েসে ঠাকমাকেও মানুষের হাতে মরতে হলো!

আমার এতো ভয় করছে! মনে হলো আর একটু পরে আমিও হয়তো মরে যাব! আমি আর ছুটতে পারছি না। আমার দেহটা কী রকম টলমল করছে। একটু দাঁড়ানো যায় না? দাঁড়ালেই যদি আবার গুলি করে দেয়! না তাই টলতে টলতেও আমি ছুটতে লাগলুম।

মনে হলো অনেকটা পথ বন ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছি। এবার বোধ হয় দাঁড়ানো যায়। সামনে একটা খাবলা-কাটা খাদ। তার ভেতরে ঝটপট লুকিয়ে পড়লুম। জায়গাটা বেশ ঘুপচি। এখানে লুকিয়ে থাকলে আমায় নিশ্চয়ই কেউ খুঁজে পাবে না। যদিও মনে হচ্ছিল অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু কতটা যে পথ এসেছি, সেটা ভেবে বার করার মত বুদ্ধি তখন আমার ছিল না। কারণ, উত্তর-দক্ষিণ, পুব-পশ্চিম কোনদিকের পথ ধরে এ কোথায় এলুম, এই অন্ধকার রাতে তা ঠাওর করার অবস্থা আমার তখন নয়। পিঠের অসহ্য যন্ত্রণায় সারা শরীরটা তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে। কী ভীষণ জ্বালা। আমি ওই খাদটার মধ্যে লুটিয়ে পড়লুম। তারপর কখনও চিৎ হয়ে, কখনও উপুড় হয়ে খাদের মধ্যে গড়াগড়ি খেয়ে কাতরাতে লাগলুম।

কতক্ষণ এমনি করেছি আমার মনে নেই। মনে নেই যন্ত্রণাটা আমার বাড়ছিল না কমছিল। কিন্তু আমি হঠাৎ শুনতে পেলুম, একটা যেন কিসের শব্দ, এই নির্জন বনে টুং টুং করতে করতে আমার কানে এসে বাজছে! আমি চমকে উঠলুম। আমি এতদিন বন-জঙ্গলে বাস করছি, এ-রকম অদ্ভুত শব্দ আমি আর কোনদিন শুনিনি। কেমন যেন ভালো লাগছিল। ঠিক এই সময়ে আমি

Scanned with CamScanner

বুঝতে পারছিলুম না, এই পিঠের যন্ত্রণাটা আমায় বেশি জ্বালা দিচ্ছে, না ওই শব্দটা আমার মনকে বেশি খুশি করে তুলছে।

আমি গড়াগড়ি খেতে খেতে উঠে বসলুম। কান দুটো খাড়া করে শুনতে লাগলুম। সেই অন্ধকার বনের গাছ পাতার ফাঁক দিয়ে, ঝোপ-ঝাড় ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে সেই টুং টুং শব্দটা ভেসে ভেসে আমার কানে এসে বেজে উঠছে। হঠাৎ যন্ত্রণাটা এত কম বলে মনে হচ্ছে! আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এতক্ষণ যে যন্ত্রণার জ্বালায় আমি ছটফটিয়ে মরছিলুম, সেটা যে হঠাৎ এমন চট করে কমে যাবে, এতো ভাবাই যায় না। পিঠের রক্তটা পেট দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে গড়াচ্ছে। আমি চেটে-চুটে পরিষ্কার করে ফেলছি। রক্তটাও এখন অনেকটা কম। একটু আগেও আমার মনে হয়েছিল, আমি বাঁচব না। এখন যেন সে ভয়টাও আমার কেটে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে বন্দুকের গুলি আমার পিঠে ঢোকেনি। শুধু পিঠের ওপর ঠোক্কর মেরেছে। পিঠ ছুঁয়ে বাইরে ফস্কে উড়ে গেছে। তাহলে হয়তো এখন আমি সত্যিই মরছি না।

আমি মরতুম, নিশ্চয়ই মরতুম, যদি ঠাকমা না থাকতো! বুড়ি ঠাকমা আমাকে বাঁচাতে এসে নিজেই নিজের প্রাণ দিলে। সেই গাবদা-গাবুস ভাল্লুকটার যে কী হলো, তা দেখার আর সুযোগ হলো না। সেটাও হয়তো অক্কা পেয়েছে।

একদিন ঠাকমা বলেছিল, "আমি তো বুড়ি হয়েছি। আমার দাম কি বল?" কিন্তু সে-কথাটা যে কতো মিথ্যে, ঠাকমা আমায় বাঁচাতে এসে সেটাই প্রমাণ করে গেল। আজ আমি স্পষ্ট বুঝেছি, ছোট থাকো কিম্বা বুড়ো হও, যতদিন বেঁচে থাকবে, জীবনের দাম ততদিনই সমান থাকবে।

শেষ অবধি যে কী হলো ঠাকমার কে জানে! ওখানেই ছিটকে পড়ে রইলো, না মানুষ তাকে বয়ে নিয়ে গেল নিজেদের আস্তানায়! ঠাকমার ছালটা গা থেকে খুলে নিয়ে হয়তো নিজেদের ঘর সাজিয়ে রাখবে। কী নিষ্ঠুর! আজই প্রথম, আমার জ্ঞানে আমি ঠাকমার কাছ থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলুম। চিরদিনের মত। আর আমি ঠাকমাকে কোনদিনই দেখতে পাবো না।

সত্যিই, এদিকটা আমার একেবারে অচেনা। এদিকে কোনদিন এসেছি বলে আমার মনেই হচ্ছে না। আমি বাঘ। এ-রকম একটা বেপট জায়গায় কতক্ষণ লুকিয়ে থাকা যায়! কেউ না কেউ দেখে ফেলতে পারে। তখন আবার আর এক ঝামেলা। এক বিপদ থেকে আর এক বিপদ! সুতরাং যা হোক করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে হবে। কিন্তু এখনই যদি তুমি আমার মুখখানা দেখতে পেতে, তাহলে তোমার বুঝতে এতটুকু কষ্ট হতো না, ঘর যে আমার কোনদিকে তা আমি একদম ভুলে গেছি। ভুলে গেছি ঠিক, তবু আমায় খুঁজে বার করতে তো হবে!

ঘরে ফিরলেও ঘরের ছেলেকে ছেলে বলে ডাকবার আর কেউ নেই। এখন আমি একা। সঙ্গীহীন। কী ভাগ্য আমাদের দেখো, একটা বংশের সকলে মানুষের কবলে পড়ে কেমন শেষ হয়ে গেল। এখন মনে হয়, ওই বন্দুক নামে গুলি ভর্তি যন্ত্রটা যে বার করেছিল সে যতই বুদ্ধিমান হোক, তাকে আমি কোনদিন ভালোবাসতে পারবো না। আমার ভাগ্যেই বা কী আছে, কে জানে!

আঃ! ওই শব্দটা ভারি সুন্দর! একটানা এখনও কেমন বেজে চলেছে। কিন্তু শব্দটা কিসের আর কোথা থেকেই বা আসছে, এখান থেকে আমি বুঝতেই পারছি না। কেমন যেন মন চাইছে শব্দটার কাছে চলে যেতে। কিন্তু আবার যদি কোন বিপদ হয়!

আমি উঠে দাঁড়ালুম। গুটি গুটি পা-পা এগিয়েই চললুম। খুব সাবধানে ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগলুম। তবু রক্ষে, জঙ্গলটা এখানেও এতটুকু হালকা নয়। সুতরাং লুকিয়ে-ছাপিয়ে চলতে ফিরতে খুব অসুবিধে নেই। আমি ওই শব্দটার দিকে কান স্থির রেখে এগিয়ে চললুম। ঝরে পড়া শুকনো শুকনো পাতার ওপর মাঝে মাঝে আমার পা যখন পড়ছে, তখনই কেমন খসখসানি আওয়াজটা আমায় থমকে দিচ্ছে। থামছি, আবার আলতো পায়ের ডিঙি মেরে এগিয়ে চলছি। এখন মনে হচ্ছে ঠিক পথেই হাঁটছি। কেননা, শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে আমার কানে ভেসে আসছে। আরও কাছে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আর ক পা হাঁটলেই নাগাল পেয়ে যাবো।

সত্যিই নাগাল পেয়ে গেলুম। দৃশ্যটা দেখে আমি চমকে গেছি। হতভম্বের মত থমকে দাঁড়িয়ে দেখি, ওই অন্ধকারে, ঘন-জঙ্গলের একটা গাছের গোড়ায় চুপটি করে বসে বসে একটা ছোট্ট ছেলে হাত দিয়ে কী যেন বাজাচ্ছে! আর সেই বাজনাটা দিয়ে ওই মিষ্টি শব্দটা বেরিয়ে আসছে। আমি অবশ্য পরে জেনেছিলুম, ওই বাজনাটার নাম বেহালা। একটা মানুষকে এই সব-প্রথম চাক্ষুষ দেখে, আশ্চর্য, আমার কিন্তু মনে হলো না, ওর টুঁটিটা টিপে ওর কম্ম শেষ করে দি! তার বদলে আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম আর থ হয়ে বেহালার সুর শুনতে লাগলুম! কিন্তু কে এই ছেলেটি একা, এই জঙ্গলে? আর একটু এগিয়ে যাই, এ আমার সাহস হলো না। কারণ, আমায় দেখতে পেয়ে ভয়েময়ে ছেলেটি যদি পালায়! তাহলে আমি তো আর ওই বাজনাটা শুনতে পাবো না। তাই এখানেই হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়লুম। আর তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম।

তারপরেও অনেকক্ষণ বাজনা বাজলো। অনেকক্ষণ ধরে আমি শুনলুম। ঠিক এই সময়ে কেন জানি আমার হঠাৎ মনে হলো, আমিও যদি বাজাতে পারতুম! কিন্তু এমন চিন্তা আমার মগজে আসাই মিছে। বাঘ কখনও বাজনা বাজাতে পারে?

বাজাতে পারে না, কিন্তু শুনতে শুনতে বাঘ যে এমন মোহিত হয়ে যেতে পারে, তা জানা ছিল না। সত্যি, আমার তখন মনে হচ্ছিল, দিনের পর দিন যদি ওটা বেজে যায়, তাহলে দিনের পর দিন আমি চুপটি করে বসে বসে ওর সুর কান পেতে শুনে যাব!

মাঝে মাঝে গাছের ডালে এক-একটা পাখি হঠাৎ মিষ্টি সুরে ডেকে ওঠে। কিন্তু সে-ডাক আমায় এমন অবাক করে দেয় না। কারণ, ওরা তো ডাকেই। ডাকবেও। পাখির ডাক আমার কাছে কিছু নতুন বলে মনে হয় না। জন্ম থেকেই ওদের ডাক শুনে আসছি। আমার এতদিন জানা ছিল মানুষ খালি বন্দুক উঁচিয়ে আমাদের মারবার জন্যে গুলি চালায়। কিন্তু তারা যে এমন বাজনা বাজাতে পারে, সে-কথা তো আমায় কেউ বলে দেয়নি। আশ্চর্য, যে-হাত দিয়ে মানুষ ভয়ংকর অস্ত্র চালায় সে-হাত দিয়েই আবার এমন সুর বেরোয়!

হঠাৎ চমকে উঠলুম। যে-শব্দটা এতক্ষণ একটানা বেজে যাচ্ছিল, সেটা আচমকা থেমে গেছে! কী রকম নিশ্চুপ হয়ে গেল চারিদিক। জমাট থমথমে। আমার চোখটাও থতমত খেয়ে সেই ছেলেটির দিকে তাকালো। দেখলুম, উঠে দাঁড়াচ্ছে। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। পাছে আমায় দেখতে পায়, আমিও তাই চট করে আরও একটু আড়ালে সরে গেলুম। কান দুটোকে সজাগ রেখে, তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলুম।

হঠাৎ ঠং করে কী যেন বেজে উঠলো। এতো বাজনার শব্দ নয়! দেখলুম ছেলেটি হাঁটছে। আবার বাজলো ঠং। তারপর ঠং ঠং। দেখছি যতবারই পা পড়ছে ততবারই ঠং ঠং করে শব্দ বেজে উঠছে। আমার দৃষ্টি যতটা স্পষ্ট করা যায়, সে-চেষ্টার কসুর করলুম না। আমি দেখতে পেলুম, এতক্ষণ যেটা সে বাজাচ্ছিল, সেটা হাতে নিয়ে পা দুটো টেনে টেনে সে হাঁটছে। তার পায়ের দিকে চোখ পড়তেই দেখি, পা দুটো বাঁধা। হাঁটতে পারছে না। তবু হাঁটছে। আর পায়ের বাঁধার শব্দটা ঠং ঠং করে বাজছে।

অমনি কষ্ট করেই খানিকটা এলো সে। আমিও এক-পা

Scanned with CamScanner

এক-পা করে এগিয়ে এসেছি। এই জায়গাটায় দাঁড়ালো সে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এখানটায় একটা উঁচু মতো ঢিপি। সেই ঢিপিটার সামনে নুয়ে পড়ে মাথা ঠেকালো। তারপর নরম গলায় ফিসফিস করে বললে, "মা, তুমি ঘুমিয়েছ মা? আর যে আমি পারছি না মা। আমার যে হাত ব্যথা করছে!" বলতে বলতে ছেলেটি ডুকরে ডুকরে কেঁদে ফেললে। কাঁদতে কাঁদতে সেই জায়গাটার গা-ঘেঁসে, বাজনাটা মাথার কাছে রেখে, নিজেও শুয়ে পড়লো।

আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, ওখানে কোথায় ওর মা! আর থাকলেও অন্তত একবারও তো আমি দেখতে পেতুম। আমি উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলুম। ভাবলুম, শুয়ে থাকলে যদি ওর মা আসে! আমার ঠাকমাও তো কতদিন আমার ঘুম পেলে আমায় আদর করতো! আর ওর মা করবে না?

বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলুম। কিন্তু ওর মায়ের দেখা পেলুম না। না, ওর মা এলো না। দেখলুম ছেলেটার চোখ দুটি বুজে গেছে। হাত দুটি কেমন নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়লো।

এখন কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, শুধু একটিবারের জন্যে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও যদি আমি বাঘ না হয়ে মানুষ হতে পারতুম, তাহলে কী ভালোই না হতো! তাহলে আমি সাহস করে ওর সামনে যেতে পারতুম। ওর সঙ্গে একটু গল্প করতে পারতুম। চাই কি, ওর মতো আমিও বাজনা বাজিয়ে ওকে খুশি করতুম। তাতো হবার নয়। বাঘ মানুষ হতে পারে না। বাঘ সে বাঘই। কিন্তু বলিহারি যাই মাকে! এতো করে ডাকলো ছেলেটি, কাঁদলো, তবু সাড়া দিলো না।

আমি বুঝতে পারছি না, ওর পা দুটো এমন করে বাঁধা কেন! ও হাঁটছিল আর ঠং ঠং করে বাজছিল, ওটা কী দিয়ে বাঁধা! ঠাকমা বলেছিল, লোহার খাঁচায় শেকল বেঁধে বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে মানুষ। তবে কী লোহার শেকল দিয়েই কেউ ওর পা দুটি বেঁধে দিয়েছে! একটি ছোট্ট ছেলে কী এমন দোষ করেছে যে, তার এই দুর্দশা! আমার মন কেমন-কেমন করছে! মনে হলো, এক্ষুনি গিয়ে আমার থাবা দিয়ে ওই শেকলটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি!

কিন্তু এখনই ওর সামনে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কারণ, যতই হোক আমি বাঘ। আমায় দেখলে ভীষণ ভয় পেয়ে যেতে পারে। আর যাই হোক, অমন একটি ছোট্ট ছেলেকে আমি ভয় দেখাতে নারাজ। তাই এখানে চুপটি করে বসেই রইলুম।

এর মধ্যে যে কী একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটে গেছে, তা তোমাদের বলাই হয়নি। ছেলেটিকে দেখে ভুলেই গেছলুম। শুনলে খুশি হবে কিনা জানিনা, বন্দুকের গুলি-লাগা আমার পিঠের জ্বালা এখন একদম থেমে গেছে। আর একটুসও রক্ত গড়াচ্ছে না। কী মজার ভেল্কিবাজি! আনন্দে চার ঠ্যাং ছুঁড়ে বন-বন করে ঘুরপাক খেতে ইচ্ছে করছে। থাক বাবা! ঘুরপাক খেতে গিয়ে শেষে ঘোর-পাকে পড়লে, তখন আর দেখবার কেউ থাকবে না।

ছেলেটি অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, এই সুযোগে ওর কাছে একবার যাই। ওর মুখখানি একটু ভালো করে চোখ মেলে দেখি। অন্তত ওর মায়ের মুখখানাও তো একবার দেখতে পারি! একি মা বাবা, ছেলে ডাকলে সাড়া দেয় না!

আমি চারপাশটা খুব ভালো করে দেখে নিলুম। তারপর সত্যি-সত্যিই পা টিপে টিপে চোরের মতো এগিয়ে গেলুম। হুট করে সামনে হাজির হওয়াটা ঠিক না। ওর মা দেখে ফেলতে পারে! কিম্বা ছেলেটিরও ঘুম ভেঙে যেতে পারে! পেছনদিক দিয়ে গিয়ে, চুপি চুপি ওর মাথার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালুম। ওর মাকে উঁকি মেরে খুঁজতে লাগলুম। আশ্চর্য! কই ওর মা? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না! যখন থেকে ছেলেটিকে দেখতে পেয়েছি, সেই তখন থেকে একটিবারের জন্যেও আমি চোখ ফেরাইনি। তাই যদি হয়, তবে ওর মা আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়? আমার চোখকে ঠকানো কী এতই সোজা! তাই খুব সাবধানেই আঁতিপাতি চোখ ফিরিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারলুম। ফোক্কা! তখন একটু সাহস করে ঘুমন্ত ছেলেটির মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। একদম কাছে, এত কাছ থেকে একটা মানুষের চেহারা এই সব-প্রথম আমি চোখ মেলে দেখছি। ছেলেটি যেন বড্ড ক্লান্ত। শত ছিন্ন একটা কাপড় পরে আছে। মাথার চুলগুলো এলোমেলো রুক্ষ। আর পায়ের লোহার শেকলটা ওর পায়ের তুলনায় অ-নে-ক—অনেক বড়। ছেলেটির বয়স আমি বলতে পারবো না। আমার নিজেরই বয়েস আমি জানি না। কিন্তু এটা বুঝতে কষ্ট হলো না, ছেলেটির যত বয়েস তার চেয়ে আমি অনেক বড়। ছেলেটির গড়ন দেখে আমার বেশ মনে হলো, এক সময়ে ছেলেটির স্বাস্থ্য ছিল সুন্দর। তুমি হয়তো জিগ্যেস করতে পার, "সুন্দর স্বাস্থ্য বলতে তুমি কী বোঝ হে ছোকরা?" উত্তরে আমি শুধু বলতে পারি, তা জানি না। জানি শুধু ছেলেটিকে আমার ভালো লাগছে!

হঠাৎ ওর মাথার দিকে ওই বাজনাটার ওপর আমার নজর পড়লো। আমি আর একটু কাছে এগিয়ে গেলুম। ভালো করে এবার বাজনাটাই দেখতে লাগলুম। বললে তুমি বিশ্বাস করবে না, এই অন্ধকার রাত্তিরে হঠাৎ আমার মাথায় একটা আজগুবী চিন্তা গজিয়ে উঠেছে। আমার মন বলছে, আমিও তো বাজনাটা বাজাতে পারি! শুনে তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, আমার মতো গো-মুখখু এ-জগতে দুটি নেই। বাঘ আবার বাজনা বাজাবে, কী! আমি গো-মুখখু কী অন্য কিছু এ-সব ভাববার তখন আমার সময়ই হয়নি! তখন আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, বাজালে কেমন হয়! হয়তো ভালোই হয়, কিন্তু বাজাবো কেমন করে!

মুশকিল আমার হাজারটা। প্রথমতো ছেলেটির মতো ওই বাজনাটা আমি ধরতেই পারব না। আমার তো থাবা। তারপর যদিও ধরা যায়, বাজাবো কী ঠ্যাং দিয়ে?

যা কপালে আছে! লাগে তাক, না লাগে তুক! আমি মুখ দিয়েই বাজনাটা তুলে নিলুম ঝট করে। ছুট্টে, একটু দূরে, একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লুম! এইরে যা! সেই যে লম্বা ছড়িটা, যেটা দিয়ে টেনে টেনে বাজাচ্ছিল, সেটা যে আনতে ভুলে গেলুম! যাকগে, থাবার নোখ দিয়েই বাজাই। দেখা যাক না!

সত্যিই, নোখগুলো বাজনার ওই তারের ওপর বুলিয়ে দিতেই বেজে উঠলো, টুং-টুং-টুং! বুকের ভেতরটা কেমন শিউরে উঠলো। ওঃ! আমি বাজাতে পেরেছি! আর একবার দেখি! আবার বেজেছে, টুং-টুং-টুং! কী মজার কান্ড! তবে তো দেখছি ব্যাপারটা খুব শক্ত নয়! শক্ত নিশ্চয়ই। কেননা, ওই ছেলেটি যেভাবে বাজাচ্ছিল, আমি তা পারছি কই? ওর হাতে কেমন একটা টানা-টানা সুর বেজে বেজে কেঁপে উঠছিল। আর আমি বাজাচ্ছি, কাটা কাটা টুং-টুং-টুং! বেজেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে না। তবু কিন্তু বাজাতে ভালো লাগছে। আমি বাজাতেই লাগলুম। একফাঁকে একবার উঁকি মেরে দেখে নিলুম ওদিকটা। না, না, ছেলেটি এখনও ঘুমুচ্ছে। তবে খুবসে বাজাই! ট্যাং-ট্যাং, টুং-টুং!

আমি একটা আস্ত গাধা। দেখো, একটু সাবধান তো হওয়া উচিত। তা নয় একেবারে জ্ঞান হারিয়ে বাজনা বাজাচ্ছি! একবার মনেও হলো না, ছেলেটির ঘুম ভেঙে যেতে পারে!

পারে মানে কী! ঘুম তো ভেঙেই গেছে। ওর পায়ে-বাঁধা শেকলটার ঠং ঠং আওয়াজ হঠাৎ শুনতে পেয়েছি আমি! ঝট করে বাজনা থামিয়ে উঁকি মেরে দেখি, সত্যিই তো ছেলেটি

Scanned with CamScanner

এদিকেই আসছে। আর থাকে এখানে! বাজনা-টাজনা ফেলে রেখেই, দে চম্পট। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে, আর একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। জঙ্গল বলে রক্ষে। এদিক ওদিক ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়া খুব সোজা। লুকিয়ে লুকিয়ে ঝোপের ভেতর থেকে একে ওকে দেখাও খুব সোজা। আমিও ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখলুম, আমি যেখানে বাজনাটা ফেলে এসেছি, ছেলেটি ওই পায়ের শেকল টেনে সেইখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। বাজনাটা হাতে তুলে নিলো। তুলে নিয়ে কেমন ফ্যালফ্যাল করে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলো। আমি নিশ্চিত জানি, ওর পায়ে যদি ওই ভারী শেকলটা বাঁধা না-থাকতো, তবে ও এ-ঝোপ ও-ঝোপ ছুটে ছুটে ঠিক আমায় খুঁজে বার করতো। এখুনই আমি যদি ওর নজরে পড়ে যাই, তাহলে কী কাণ্ডটা হয় বলো? হয় এক্ষুনি আমায় ডাক ছেড়ে পালাতে হবে আর তা না হলে ওর ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে, ওকে আঁচড়ে-কামড়ে শেষ করে ফেলতে হবে!

আমার ভাগ্যটা খুব ভালো। দুটোর কোনটাই করতে হলো না। আমায় দেখতে পেলো না ছেলেটি। দেখতে না-পেয়ে, বাজনাটা হাতে নিয়ে আবার পায়ের শেকল টানতে টানতে হাঁটা দিলে। ওকে ওভাবে হাঁটতে দেখে, সত্যি বলছি, আমার নিজের ওপর এমন রাগ হলো! মনে হলো, ছ্যাঃ, ছ্যাঃ; আমার জন্যেই তো ওর ঘুম ভেঙে গেল। আমার জন্যেই এমন কষ্ট করে মোটা শেকলটা টানতে টানতে এখানে উঠে আসতে হলো!

আবার সেই নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো ছেলেটি। বসে, তেমনিভাবেই অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো এইদিকেই। আমি কিন্তু গুড়গুট্টি মেরে ঠাই বসে। না নড়ছি, না টুঁ শব্দ করছি। কোন কিছুর সাড়া-শব্দ না-পেয়ে কী আর করে ছেলেটি, আবার শুয়ে পড়লো। হয়তো আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

এক্ষুনি এখান থেকে বেরুনো একদম বুদ্ধিমানের কাজ নয়! কারণ, ওর চোখে এখনও যদি ঘুম না এসে থাকে! তাই আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ ঝোপের মধ্যে অমনি করেই বসে রইলুম।

এখন মনে হচ্ছে, না, ছেলেটি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি আবার বেরিয়ে এসেছি। আবার থমকে থমকে হেঁটেছি ওর দিকে। এবার ঝোপের আড়াল দিয়ে গা ঘেঁসিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ালুম। এবার আর বাজনাটার দিকে নজর না, ওর পায়ের দিকে নজর গেল। ওই ছোট্ট পা দুটিকে কে যে এমন করে লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে দিয়েছে! তার কোন দয়া মায়া নেই। দেখতে দেখতে আমার মনে হচ্ছে, যে ওর পা দুটি বেঁধে দিয়েছে, সে হয়তো চেয়েছে, ওই পা চির-দিনের মতো থেমে যাক। ও যেন আর ছুটতে না পারে! এই বন পেরিয়ে হাঁটতে না পারে! থাক বন্দী হয়ে এই গভীর জঙ্গলে!

আমি ভালো করে দেখবো বলে, আর একটু এগিয়ে গিয়েছিলুম। দেখবো, শেকলটা খোলা যায় কিনা! কিন্তু হঠাৎ এমন আচমকা খিলখিল করে হেসে উঠেছে ছেলেটি, আমি একেবারে থতমত খেয়ে গেছি! এত চালাক, আমায় ধরবে বলে, ঘুমের ভান করে চুপ মেরে শুয়েছিল! উঃ, আমায় ধরা তো অত সহজ নয়! আমিও মেরেছি এক ডিগবাজি। তাই দেখে ছেলেটি আরও জোরে হেসে উঠলো। বললে, "কোন দেশের বাঘ বাবা, আমায় খেতে এসে পালালো!"

আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরে? ঝোপের আড়ালে জুজুবুড়িটির মতো নিঃঝুম মেরে বসে রইলুম। ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো। বললে, "পালাবে কোথায়! এক্ষুনি ধরছি!"

আমি তো জানি, ও ধরতে পারবে না। তাহলেও কিন্তু এবার আমার উঁকি-ঝুঁকি মারতে সাহস হলো না। কেননা, একটা জ্যান্ত মানুষকে সামনে পেয়েও, আমি ভীতুর মতো পালালুম! আর কেউ শুনলে ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, করবে না!

ছেলেটি কী সাবধানী দেখো! দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম! এবার যে সে হেঁটে হেঁটে এদিকেই আসছে, তা আমি বুঝতেই পারিনি! কারণ, এমন পা টিপে টিপে নিঃশব্দে হেঁটেছে যে, তার পায়ের ওই শেকলটার ঠং ঠং শব্দটি পর্যন্ত আমার কানে ঢোকেনি। আমার পেছনদিক দিয়েই এসেছিল সে। আর আমি হাঁদার মতো সামনে মুখ উঁচিয়ে বসে আছি। ছেলেটি করেছে কী, পেছনদিক দিয়ে এসে আমাকে আচমকা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো, "এই ধরেছি!"

আমি যে তখন কী সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গেছলুম, তা এখন মুখে বলা আমার কম্ম নয়। ভয় পেয়ে ছেলেটিকে এক ঝটকা দিয়ে আমি মারলুম লাফ। ছেলেটি মুখ থুবড়ে আছাড় খেলো। আর আমি সিধে লম্বা!

সত্যি বলছি, আমি ভয় পেয়েছি এই কথাটা ভাবতে এতো লজ্জা করছে! বাঘের মুখে ভয়ের কথা শোভা পায়? কী বদনাম! না, না, চম্পট দিয়ে ভেগে পড়াটা একদম উচিত না। একটা মানুষের বাচ্চা-ছেলের কাছে আমি হেরে যাবো! কক্ষনো না। আমি হার মানি না, মানবো না। আমি ছেলেটাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে দেব। আমাকে কী ঠাউরেছে! ল্যাজ নাড়া কুত্তা!

আমি যেমন তীরের মতো লম্বা দিয়েছিলুম, ঠিক তেমনি তীরের বেগে ফিরেও এলুম। কিন্তু বললে হাসবে হয়তো, শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক ওর তখনকার সেই অবস্থা দেখে আমি সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেছি! দেখি, ছেলেটা আমার ঝটকা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। উঠতে পারছে না। পায়ের শেকলটা একটা আগাছার সঙ্গে প্যাঁচ লেগে জড়িয়ে গেছে। ভীষণ কষ্ট করে টানাটানি করছে। কিন্তু ওর কী সাধ্য ওটা খুলতে পারে!

আমি সামনে এসে দাঁড়াতে, অত কষ্টেও ছেলেটি মুখখানা হাসি হাসি করে বললে, "আমায় ফেলে দিয়ে পালালি বলে দেখ, আমার কী হলো!"

আমি ভাবলুম, ও নিজেই আর যদি বেশি টানা-হ্যাঁচড়া করে, তবে পা কাটবে, রক্ত পড়বে। ওর ওই হাল দেখে আমার পায়ের থাবা চারটে নিশপিশ করে উঠলো। আমার মনে হলো, এখনই এই থাবা দিয়ে ওর পায়ের শেকলটা দুমড়ে মুচড়ে খান খান করে ফেলি। আমার দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠলো। চটপট শক্ত শেকলের আংটাটা দাঁতে চেপে ধরেছি। চেপে থাবা দিয়ে যেই চাপ দিয়েছি, "খটাং!" খালি একটি আওয়াজ। তারপর টুকরো হয়ে শেকলটা ছিটকে পড়লো। এতো একটা পায়ের আংটা। আর একটা? একটা যখন ভেঙেছে আর একটা কী থাকে? সেটাকেও নিমেষে চুরমার করে দিলুম!

ওঃ! যাক এতক্ষণে ঠিকঠিক কাজে লাগাতে পেরেছি আমার গায়ের জোরটাকে। ছেলেটিও অবাক হয়ে এতক্ষণ আমার দিকেই চেয়েছিল। এবার খুশিতে তার মুখখানি উছলে উঠলো। আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো সে। চিৎকার করে উঠলো। তারপর ছুটে পালালো। ছুটতে ছুটতে মায়ের কাছে চলে গেল। বললে, "মা, দেখো, দেখো, বাঘ আমার পায়ের শেকল ভেঙে দিয়েছে মা। মা, দেখো, এখন আমি ছুটতে পারছি। মা, দেখো, আমি লাফাচ্ছি।"

কিন্তু এবারও আমি ওর মাকে দেখতে পেলুম না। দেখলুম, ছেলেটি কেঁদে ফেলেছে। হয়তো আনন্দে কিম্বা খুশিতে। কাঁদতে কাঁদতে বললে, "মা, তোমাকে যারা মেরেছে তাদের আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না মা, কিছুতেই না। মা, এবার আমি বাবাকে মুক্ত করে আনবো। বলো না পারবো না?"

আমি তখনও দূরে দাঁড়িয়েছিলুম। দূর থেকেই কথাগুলো আমার কানে এলো। কী রকম গোলমাল হয়ে গেল আমার মাথাটা। আমি কিছু বোঝবার আগেই, অবাক হয়ে ও নিজের মনেই আবার বলে উঠলো, "আমার গায়ে রক্ত কোথা থেকে লাগলো!"

Scanned with CamScanner

হঠাৎ আমি নিজের গায়ের দিকে চেয়ে দেখি, আমার গায়েও রক্ত! গুলির আঘাত লেগে যেখানটা আমার কেটে গেছে, সেখান দিয়ে আবার রক্ত পড়ছে। থেমে গেছলো। কিন্তু লাফা-লাফি করতে গিয়ে বোধ হয় আবার লেগে গেছে! মনে হচ্ছে, আমার গায়ের রক্ত ওই ছেলেটির গায়ে লেগেছে! ও আমায় যখন জড়িয়ে ধরেছিল, বোধ হয় তখন।

ছেলেটি ছুটে আমার কাছেই এলো। এবার আমি কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ও আমার পিঠে হাত দিলো। আমার পিঠে গুলির আঘাত দেখে আঁৎকে উঠলো। তারপর নিজের ছোট্ট হাত দিয়ে, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করলে, "কে তোকে গুলি মেরেছে রে? আহা!"

আমি এখন বলতে পারবো না, তখন আমার কী ভালো লেগেছিল! আমি বাঘ, নইলে আমি হয়তো কেঁদে ফেলতুম! কাঁদবো কী, তখন তো আমি একদম বোবা! বোকার মতো জুলজুল চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। বলতে লজ্জা কিনা জানি না, তখন আমি নিজেই নিজেকে বাঘ বলে মনে করতে পারছিলুম না। আমার যেন মনে হচ্ছিল, এই চুপ-চুপ নির্জন বনে এখন এই ছেলেটি আমার একান্ত বন্ধু। কিম্বা বলা যায়, আমি ওর আপনজন।

ঠিক এখনই আমি মনে করতে পারছি না, ছেলেটি কতক্ষণ আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল। মনে করতে পারছি না, কী কথা তখন সে আমায় আদর করে বলেছিল। আমি সত্যিই বেবাক হয়ে গিয়েছিলুম। মনে মনে ভেবেছিলুম এ-ও হয়? মানুষ আমাকে মারবে বলে আমাকে তাক করে বন্দুক মেরেছিল। আবার সেই মানুষ আমার পিঠের রক্ত মুছিয়ে দিতে, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করছে!

ছেলেটি বললে "বোধ হয় ভেবেছিলি, আমি বাঘ দেখে ভয় পাবো? হুঁ! আমার আবার ভয় কিসের! আমাকে তো ওরা বাঘের পেটে দেবে বলেই, আমার পায়ে শেকল বেঁধে এই বনে ফেলে দিয়ে গেছে।"

আমি ওর কথা শুনলুম, কিন্তু কিছু বলতে পারলুম না।

ছেলেটি আবার বলেল, "আমি কতদিন ধরে বনে বনে ঘুরছি, কেউ তো আমায় খেয়ে ফেললো না। তুই-ও এলি, অথচ আমায় মারলি না। আমার বেহালা নিয়ে বাজাতে সুরু করলি। কোন দেশের বাঘরে তুই? কী রকম বাঘ?"

আমি তো এ এক আচ্ছা লজ্জায় পড়লুম। বলতে পার, ছেলেটি আমায় ওই কথা বলে ভীষণ ফ্যাসাদে ফেলে দিয়েছে। সত্যিই তো! বাঘ কোথায় বনে বনে হাঁক ছেড়ে ঘুরে বেড়াবে,

Scanned with CamScanner

তা নয় বেহালা নিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে! কে শুনেছে বাবা এমন কথা! কিন্তু পালাবো যে, তাওতো পারছি না। লজ্জা নেই, বলতে, এখন আমি ওই ছোট্ট ছেলেটিকে ছেড়ে পালাবার কথা ভাবতেই পারছি না। ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভীষণ সাহসী। আমাকে একটুও ভয় পেলো না! যাই বলো, তাই বলো, বীরের মতো মাথা উঁচিয়ে যে সাহস দেখায়, তাকে কার না ভালো লাগে? আমার মতো বাঘের তো লাগবেই। কারণ, বাঘও তো বীর। তবে আমাকে হয়তো বীর বলতে তোমার মন না-ও চাইতে পারে। ভাবতে পারো, বাঘ হয়ে একটা ছোট্ট ছেলের সঙ্গে ভাব করার জন্যে যে উসখুস করে, তাকে বীর বলবে না আর কিছু। তুমি যাই ভাবো, আমার কিন্তু ছেলেটিকে বড্ড ভালো লেগেছে।

রক্ত থেমে গেছে । ছেলেটি আমায় ছেড়ে আবার ছুটে গেল। ছুটে গেল ওর মায়ের কাছে। বললে, "যাই, মায়ের ঘুম ভেঙে গেছে! আমি বাজনা না বাজালে মায়ের ঘুম আসবে না।"

ছোট্ট ঢিপিটার কাছে বসে বসে সে আবার বাজনায় সুর বাজালে। মিষ্টি সেই শব্দটা আবার নির্জন বনে ভেসে ভেসে হারিয়ে যাচ্ছে। ভাবছি, ও আমাকেও যদি ওইটা বাজাতে শিখিয়ে দেয়! ইচ্ছে আমার ষোল আনা! কিন্তু ক্ষমতা তো আর নেই! ক্ষমতা থাকলেই বা কী! আমি তো কথাই বলতে পারি না। ওকে কেমন করে বোঝাবো, আমি বাজনা শিখতে চাই।

কখন অজানতে আবার ছেলেটির কাছেই আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি! আমাকে দেখতে পেয়ে ও থামলো। আমার কানের কাছে মুখ এনে নিচু গলায় বললে, "চুপ, কথা বলিস না। মা ঘুমুচ্ছে, এইখানে, এই মাটির নিচে।"

আমি চোখ ফিরিয়ে দেখলুম। ভাবলুম, "বাবা! মানুষ মাটির নিচে ঘুমোয় কেমন করে?" সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কী রকম একটা রহস্য বলে মনে হচ্ছে। সবটার মধ্যে কী যেন গোলমেলে গন্ধ! আমি ওই ঢিবিটার দিকে আবার তাকালুম। কিছুই হদিশ করা গেল না।

ছেলেটিই বললে, "তুই দেখতে পাবি কী করে? আমি ছাড়া মাকে কেউ দেখতে পায় না। রোজ আমার মা এই মাটির নিচ থেকে উঠে এসে, আমার চিবুক ধরে আদর করে। আমার কপালে চুমু খায়। আমি "মা" বলে ডেকে উঠে, মাকে আদর করে যেই জড়িয়ে ধরি, মা হারিয়ে যায়!" বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পড়লো ছেলেটি। আমি অন্ধকারেও লক্ষ্য করলুম, তার চোখ দুটি ছলছল করছে। চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তারপর ঠোঁট দুটি ওর কেঁপে উঠলো। আমার চোখের দিকে কী রকম অসহায়ের মতো তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললে, "ওরা আমার মাকে মেরে এইখানে শুইয়ে রেখে গেছে। যে মেরেছে সে একটা দস্যু। একটা শয়তান। তার নাম হুড্ডা-গুড্ডা!"

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালুম। চারিদিক নিস্তব্ধ! নিস্তব্ধ বনের অন্ধকারে আমি দেখতে পেলুম, ওর চোখ দুটো যেন জ্বলছে। হয়তো রাগে। না কি আর কিছু আছে ওর মনে আমি তা বুঝতে পারিনি। আমার শুধু মাথায় তখন একটা কথাই ফিরে ফিরে ঘুরে আসছে। আমি ভাবছি, হুড্ডা-গুড্ডা কী কোন জন্তু, না মানুষ! হুড্ডা-গুড্ডা বলে কোন জন্তুর নাম তো কখনও শুনিনি!

আবার ছেলেটি কথা বললে। বললে, "জানিস, আমার বাবা খুব ভালো বেহালা বাজাতে পারে! আমার হাতে এই যে বেহালাটা দেখছিস, এটা বাবাই আমায় কিনে দিয়েছে। আমি বাবার কাছেই এটা বাজাতে শিখেছি! আমার বাবা কে জানিস? আর আমি? আমার বাবা রাজা। আমি রাজপুত্র!" এইটুকু বলে ছেলেটি থামলো। একটুখানি ক্লান্ত হাসি ওর ঠোঁট দুটি ছুঁয়ে মিলিয়ে গেল।

তারপর নিজেই জিগ্যেস করলে, "তুই শুনবি আমার কথা?"

আমি কী বলব!

"তুই শুনেই বা কী করবি! তুই তো বাঘ! আমার কথা বুঝবি কিছু?"

আমি ঘাড় নেড়েছিলুম কিনা জানি না। কিন্তু আমার ল্যাজটা অজানতে নেড়ে ফেলেছিলুম। হয়তো তাতেই ও বুঝেছিল, আমি ওর কথা শুনতে চাই। ও তাই সুরু করেছিলঃ

"আমার বাবা এই দেশের রাজা। কিন্তু আমার বাবাকে দেখলে রাজা বলে কেউ মনেই করতে পারবে না। রাজার মস্ত প্রাসাদ, সোনার সিংহাসন, মনি-মুক্তা-সাজানো রাজমুকুট, হাতি-ঘোড়া সৈন্য-সামন্ত সব ছিল। কিন্তু আমার বাবার ছিল না রাজার দেমাক। তাই গরীব-বড়লোক সবার বাড়িতে বাবা ছুটে যেতো। রাজপ্রাসাদে তাদের ডেকে আনতো। আদর করে বসিয়ে তাদের নিজের হাতে বাজনা শোনাতো। চাই কি, যে শিখতে চাইতো তাকে শিখিয়ে দিতো। বাবা ছিল খুব সুখী। বাবার রাজত্বে ছিল প্রচুর আনন্দ। কোনদিন যুদ্ধ করতে হয়নি বাবাকে। কেন করতে হবে! কারুর সঙ্গে তো শত্রুতা ছিল না তার। অন্য কোন রাজ্যের একমুঠো মাটিও বাবা কোনদিন নিজের হাতে ছোঁয়নি। কিন্তু উল্টে নিজের দেশের মাটি সোনায়-সোনায় উপচে গেছলো। বেহালা বাজানো এটা তো ছিল বাবার সখ। আর তাই সখ করে বাবা আমাকেও বাজনা শেখাতো। আমি যখন শিখতুম, বাজনার তারে সুর ছড়িয়ে যখন মাথা নাড়তুম, তখন বাবা মাকে ডেকে বলতো, "রাণী, দেখো, দেখো, তোমার ছেলে তার বাপকেও হার মানাবে।" এ কথা শুনে আমার তখন ভীষণ লজ্জা করতো। কিন্তু কী আনন্দ যে লাগতো! আমার বাবা জানতেই পারেনি, আমাদের এই সুখের রাজত্বে এক শয়তানের দৃষ্টি পড়েছে! কে জানতো, এখানে এক শয়তান বাসা বেঁধেছে!

"দলবল নিয়ে গভীর জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছিল এই শয়তানটা। মানুষ খুন হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে, আমাদের রাজত্বে এই কথা কেউ কোনদিন ভাবতেই পারে না। কিন্তু ঠিক তাই হলো। একদিন দেখা গেল, আমাদের এক সৈনিক বন্দুকের গুলিতে মারা গেছে। রাস্তায় পড়ে আছে। আর একদিন খবর এলো, এক প্রজার বাড়ি লুঠ হয়ে গেছে। কেমন করে লুঠ হলো, আর কারাই-বা লুঠ করলো, কেউ বলতে পারছে না। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য, একদিন বাবার নিজের আদরের হাতি-টিকে কারা গুলি করে মেরে ফেলেছে! রাজপ্রাসাদের হাতিশালে ঢুকে, হাতিকে মারা তো সোজা কথা নয়! সবাই বুঝলো, এমন দুঃসাহসের কাজ যে করতে পারে, সে এক ভয়ংকর শয়তান!

"বাবা পড়লো ভীষণ ভাবনায়। নাওয়া-খাওয়া বন্ধ হলো বাবার। হাতের বাজনা থেমে গেলো। হুকুম হলো, যে এ-কাজ করছে তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। তখন সুরু হয়ে গেল, সেই শয়তানকে খুঁজে বার করবার জোর তোড়জোড়। বাবা নিজেও বাজনা ছেড়ে বন্দুক ধরলো। অন্ধকার রাতে নিজের সেনাদের নিয়ে সেই শয়তানকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

"কিন্তু ক'দিন হয়ে গেল, কিছু কিনারাই হলো না। সেই শয়তান ধরা পড়লো না। অবাক কথা, সে যে কখন আসে, কোথা দিয়ে আসে, কেমন করে আসে, কেউ দেখতেও পায় না, বুঝতেও পারে না!

"হঠাৎ একদিন ধরা পড়লো! ধরা পড়লো বটে, কিন্তু সেই শয়তানটা নয়, তার দলের একটা লোক। এই লোকটা ছিল শয়তানটার খুব বিশ্বাসী। তাই তাকে পাঠানো হয়েছিল রাণীকে খুন করে, তার গলায় যে মরকতের মালাটি রয়েছে, সেটি হরণ করে আনতে। আমি বলছি না, শয়তানের এই লোকটা খুব বোকা ছিল। কিন্তু মা ছিল তারচেয়ে অনেক চালাক। শুনলে অবাক লাগে, লোকটা ছদ্মবেশ পরে লুকিয়ে-ছাপিয়ে আসেনি! রাজপ্রাসাদের ভেতর মহলের চাকর সেজে সে সুযোগ খুঁজছিল। ঘরের চাকরকে কে আর সন্দেহ করবে? তাছাড়া রাজবাড়ির

অতো দাস-দাসীর মধ্যে কে কোথায়, কোন মহলে কখন যাচ্ছে, কখন আসছে, তার হিসেব রাখা তো সোজা কথা নয়! কিন্তু আমার মা রাজরাণী হলেও, ঘর-কন্নার খুঁটিনাটি কাজ সব নিজের হাতে করতো! আর সেইজন্যে মা ঝি-চাকর, দাস-দাসী, সবাইকে চিনতো! ঐ-লোকটা যে একদম অচেনা, সেটা মা তাকে এক নজরেই বুঝতে পেরেছে। তবু কিছু বলেনি। তার চলা-ফেরা, তার কাজ-কম্ম, হাবভাব সব চুপচাপ লক্ষ্য করে যাচ্ছে।

"তারপর তক্কে তক্কে এক সময় হঠাৎ মায়ের শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছিল লোকটা। ঢুকে, পালংকের নিচে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়লো। মা কিন্তু ঠিক দেখে ফেলেছে। যেন কিছু জানে না, মা এমনি ভান করে কখনও ঘরে ঢুকছে, এটা ওটা খুঁটিনাটি নাড়ানাড়ি করছে, বেরিয়ে আসছে! এমনি করতে করতে এক সময় চট করে বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে শেকল তুলে দিলো মা! লোকটা ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে গেল! মায়ের সত্যি কী সাহস, কী বুদ্ধি!

"লোকটা ধরা পড়লো। প্রাণের দায়ে সব কথা ফাঁস করে দিলো। সে-ই বললো, তারা দস্যু। তাদের সর্দারের নাম হুড্ডা-গুড্ডা। তাদের আস্তানাটা সে বাৎলে দেবে।

"দিলোও তাই। তার কথা মতো, একদিন রাজসেনাদের নিয়ে বাবা ঘোড়ার খুরে ধুলো উড়িয়ে গভীর জঙ্গলে সেই হুড্ডা-গুড্ডার আস্তানায় হানা দিলো। একটা পাহাড়ে, অন্ধকার গুহার মধ্যে তাদের আড্ডা। আচমকা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজসেনারা। কিন্তু তখন সেই দস্যু-সর্দার হুড্ডা-গুড্ডা সেখানে কোথায়? শুধু তার সাকরেদরা গুহা পাহারা দিতে সেখানে হাজির রয়েছে। চমক দিয়ে রাজসেনার বন্দুকের গুলি গর্জে উঠলো। তারা তো হকচকিয়ে গেছে। কিছু করবার সুযোগই পেলো না। আগুনের ফুলকি ছুটে ছুটে হুড্ডা-গুড্ডার গুহার আস্তানা তছনছ করে দিলো। সব কটা লোক বন্দী হলো। গুহার ভেতর থেকে উদ্ধার করা হলো, হাজার হাজার মোহর। দামী দামী হিরে-জহরৎ আরও নানান জিনিষ। সেইসব মাল-পত্তর দশটা হাতির পিঠে চাপিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হলো। তারপর ঢোল-শহরৎ করে সেই সব জিনিষ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিলো বাবা। লোকে রাজার জয়ধ্বনি দিতে দিতে ঘরে ফিরে গেল।

"ধীরে ধীরে দেশের লোক হুড্ডা-গুড্ডার কথা ভুলে গেল। কেন না, তারপর থেকে দেশে আর দস্যুর অত্যাচার রইলো না। বাবা আবার বাজনা ধরলে।

"কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটলো। সেদিনটা ছিল বাবার অভিষেকের দিন। যেদিনে বাবা প্রথম সিংহাসনে বসে প্রত্যেক বছর সেদিনটা খুব ধুমধামে উৎসব করা হয়। সারা শহরটা আলোর মালা, রঙিন পতাকা আর নানান ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সে সময়ে শহরটা দেখতে লাগে যেন রঙিন আলোর দেশ। কতো দূর দূর থেকে, কতো মানুষ এই উৎসব দেখতে আসে। কতো রাজ-রাজড়া, কতো গণ্যমান্য মানুষ, কতো কবি-গায়ক উৎসবে যোগ দেয়। তাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হয়। দেওয়া হয় প্রচুর উপহার। আর সবশেষে রাজদরবারে আসর বসিয়ে বাবা তাদের শোনায় নিজের হাতে বেহালার বাজনা।

"এবারেও অভিষেকের দিনে এসেছিলেন হাজার হাজার লোক। এবার আর বাবা নিজে বাজনা শোনালো না। বললে, "এবার আপনাদের বাজনা শোনাবে আমার ছেলে।"

"রাজদরবার লোকে লোকারণ্য। অতো লোক দেখে, আমার কিন্তু একটুও ভয় করেনি। আমি বেহালায় সুর ধরলুম। এখন আমি মনে করতে পারছি না, কতক্ষণ আমার বাজনায় সুর বেজেছিল। আর কতো লোক আমার বাজনা শুনছিল, কতো লোক থেকে থেকে আনন্দ আর খুশিতে বাহবা দিচ্ছিল। আমি যেমন একমনে বাজনা বাজাচ্ছি, আর সকলেও তেমনি একমনে শুনছে। কেউ তখন জানতেও পারেনি সেই দস্যু শয়তান হুড্ডা-গুড্ডা আর তার দলবলও রাজদরবারে হাজির রয়েছে। ছদ্মবেশে ওই অগুনতি লোকের মধ্যে মিশে এখুনই যে তারা এক ভীষণ কাণ্ড করবে বলে ওৎ পেতে বসে আছে সে-খেয়াল কার আছে?

"দুম-দুম! কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ রাজদরবারে অসংখ্য লোকের মধ্যে বোমা পড়লো। আগুনের ঝলকা এসে বাবার চোখে-মুখে লাগলো। আবার "দুম-দুম।" আগুনের ঝলকা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি সারা দরবারে ছড়িয়ে পড়লো। প্রথমটা হঠাৎ আচমকা এই শব্দে দরবারের প্রতিটি লোক হকচকিয়ে গেছলো। তারপর প্রচণ্ড চেঁচামেচি আর হুড়োহুড়ি! কে আগে পালাবে, সেই নিয়ে ঠেলামেলি আর হট্টগোল। কেউ পড়লো, কেউ মরলো, কেউ অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন কে রাজা, কে প্রজা আর কে-ই-বা গণ্যমান্য। প্রাণ বাঁচাতে সবাই কান্নাকাটি জুড়ে দিলে।

"আমার চোখ দুটোও ভীষণ জ্বালা করছে। কিন্তু হাতের বাজনা আমি ছাড়িনি। ওই ধোঁয়ার কুণ্ডুলি আমার চোখের ওপর যখন আছড়ে পড়লো, আমি ভেবেছিলুম, আমি বুঝি অন্ধ হয়ে গেছি। অন্ধ আমি হইনি। আমি আবছা চোখে দেখতে পেলুম, বাবা দু চোখে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। আমি ভয়ে চিৎকার করে বাবাকে জড়িয়ে ধরলুম। বাবা আমাকে কোলে নিয়ে ছুটতে গেল! কিন্তু পালাবে কোথায়? সেই সর্দার হুড্ডা-গুড্ডা ওদিক থেকে ছুটে এসে বাবার পায়ে লাঠির বাড়ি এমন জোরে মারলো, বাবা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে। আমিও পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে দস্যুরা ছুটে এলো। আমার দিকে না-তাকিয়ে বাবাকে ওরা বেঁধে ফেললে। বাবাকে বাঁধতে দেখে, আমি লাফিয়ে উঠে সর্দারের বুকে মেরেছি এক ঘুষি। সর্দার চিৎকার করে আমার গলাটা টিপে ধরলে। এমন টিপে ধরেছে মনে হলো, আমি এক্ষুনি দম আটকে মরে যাবো। আমি মরলুম না। সে আমার গলায় ভীষণ জোরে এক ধাক্কা মারলে। আমি চিৎপাত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলুম। আমার হাতের বাজনাটা আর একটু হলে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো। খুব বরাত ভালো, অনেক কষ্টে বাঁচাতে পারলুম। কিন্তু বাবাকে ওদের হাত থেকে ছাড়াতে পারলুম না। ওরা বাবাকে বেঁধে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল জানতে পারিনি। আর আমাকে ওরা চ্যাং-দোলা করে ঘোড়ার পিঠে তুললো। আমি উঠবো না কিছুতেই। আমি কী পারি? সর্দার নিজেই ঘোড়া ছোটালে। ততক্ষণে রাজদরবার তছনছ হয়ে গেছে।

"আমার মা এতক্ষণ কোথায় ছিল জানি না। সর্দার আমায় নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দেখে, ঘোড়ার পিঠে চেপে বন্দুক নিয়ে ছুটে এসেছে মা। এতদিন আমি মাকে দেখেছি রাজরাণী বেশে। আশ্চর্য! আজ দেখলুম মায়ের অন্য মূর্তি। মায়ের বন্দুক গর্জে উঠলো গুড়ুম! সর্দার আমাকে পাকড়াও করে ঘোড়ার পিঠে ছুটছে। মা-ও পেছনে ঘোড়ার পিঠে। হাতে বন্দুক! মা হয়তো ভেবেছিল, ঘোড়াটাকে যদি বন্দুক মেরে কোনরকমে খোঁড়া করে দিতে পারে, তাহলে আমি উদ্ধার পাব, দস্যু-সর্দারেরও দফা শেষ হবে। তাই গুলি চালালো মা ঘোড়ার পায়ের ওপর। ঘোড়া চিঁহিঁহিঁ করে ডেকে উঠে মাটিতে ছিটকে পড়েছে। আমিও পড়লুম, দস্যুটাও পড়লো ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সর্দার উঠে দাঁড়ালো ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়লো মায়ের দিকে। আমাকে ওই সর্দার-দস্যুটা এমনভাবে তার সামনে দাঁড় করিয়ে নিজে আমার আড়ালে দাঁড়ালো যে, মা আর গুলি ছুড়তে পারে না। কারণ, ছুড়লেই আমার বুকে লেগে যাবে। তাই মা ছুটে আড়ালে চলে গেল। মা হয়তো ভেবেছিল, নিঃসাড়ে সর্দারটার পেছন চলে যাবে। পেছন থেকে গুলি মেরে সর্দারের পিঠটা ঝাঁঝরা করে দেবে। মা সর্দারের পেছনেই গেছলো। হয়তো বন্দুকও তুলেছিল। কিন্তু তার আগেই শয়তানের দল মায়ের

Scanned with CamScanner

বুকে গুলি চালিয়ে দিয়েছে। মা ঘোড়ার পিঠ থেকে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। তারপর আর কথা বলতে পারেনি মা।

"রাজপ্রাসাদটা দখল করে নিলে শয়তানের দল। তারা বাবাকে বন্দী করে রাজপ্রাসাদের গারদখানায় আটকে রাখলে। আমি যতদূর জানি, বাবা এখনও সেখানেই আছে। আমাকে আর আমার মায়ের নিস্তেজ দেহটা তারা এই জঙ্গলে নিয়ে এলো। তারা আমাকে মারলো না। আমার পা দুটো শেকল দিয়ে বেঁধে দিলে। আমি যেন পালাতে না পারি। তারা ভেবেছিল, বনের বাঘ এসে আমায় জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে। আর আমার মায়ের দেহটা ওরা এইখানে, এই মাটির নিচে পুঁতে রাখলে আমার চোখের সামনে। কিন্তু তখন মাকে পুঁততে দেখে আমার চোখ দিয়ে একটুও জল পড়েনি। আমি ভেবেছিলুম, তবু ভালো আমি যদি মরি আমার মায়ের কাছেই মরতে পারবো। এখন একটা কথা কিন্তু ভাবতে ভারি আশ্চর্য লাগে। আমি যেমন আমার হাত থেকে বাবার দেওয়া বেহালাটা ছাড়িনি, ওরাও যে কেন আমার হাত থেকে এটা কেড়ে নেয়নি, আমি তা আজও জানি না। তাই এটা আমার কাছেই আছে। আমি এই বেহালাটা বাজিয়ে রোজ মাকে জাগাই, ঘুম পাড়াই। আর ভাবি, এখন আমার বাবা কী করছে রাজপ্রাসাদের গারদখানায়?"

কথা তার শেষ হলো। ছেলেটি থামলো। আমার মুখের দিকে চাইলো সে। হয়তো ভেবেছিল, আমি কিছু বলবো তাকে। তারপর যখন দেখলো বাঘ হয়েও হাঁদার মতো আমি চুপ করে আছি, ওর মুখে কেমন একটা দুঃখ-মেশানো হাসি ঝিলিক দিয়ে হারিয়ে গেল। নিজের মনেই বেহালাটা বুকে তুলে নিলে। তারপর আবার বাজাতে সুরু করলে। এখন ওর এই বাজনার সুরটা আমার মাথায় ঢুকছে কিনা বুঝতে পারছি না। কিন্তু ওর কথাগুলো গুনগুন করে আমার সমস্ত মনটাকে নাড়া দিচ্ছে। আমি ভাবছি আর অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভাবছি মানুষ বন্দুক নিয়ে শুধু বাঘই মারে না। মানুষ বন্দুক দিয়ে মানুষকেও মারে!

আমার চোখে চোখ পড়তে ওর বাজনা থামলো। আমায় বললে, "তুইতো জন্তু। মানুষের মতো কথাতো বলতে পারিস না! মানুষের মতো বাজনা বাজাতে পারবি? আমি শিখিয়ে দেব।"

আমার মনটা যেন "ধ্যাৎ" করে উঠলো।

তারপর বললে, "তুই তো বাজাচ্ছিলি। এই নে, আবার বাজা!" বলে বেহালাটা আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

আমি একটুখানি দোনোমনো করেছিলুম। তারপর সামনের একটা থাবা এগিয়ে দিলুম বাজনাটার দিকে। বাজনার তারে ঘা পড়লো, "টুং!"

ছেলেটি বললে, "বারে! বেশ তো পারিস!"

আমি আর একবার আর একটা তার টানলুম, "টাং!"

তারপর আর একটা, "টিং!"

শেষকালে একসঙ্গে, "টুং-টাং-টিং!"

একবার, দুবার, তারপর বারবার, "টুং-টাং-টিং! টুং-টাং-টিং! টুং-টাং-টিং!"

ছেলেটি খুশিতে হেসে উঠলো।

হঠাৎ চমকে উঠেছিলুম আমি। ছেলেটিও বোধ হয় চমকে গেছলো! একসঙ্গে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে এলে যেমন শব্দ ওঠে নির্জন বনে, আমি শুনলুম, তেমনি যেন শব্দ আমার কানে ভেসে আসছে। ছেলেটি চটপট উঠে দাঁড়ালো। আমায় বললে, "দস্যু আসছে! তুই এখান থেকে পালা!"

পালাবো কেন? আমি কাকে ভয় পাই! ওখান থেকে উঠে আমি একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম। আমি আগে

কখনও দস্যু দেখিনি। আমি ভাবলুম যাক ঝোপের আড়ালে বসে এবার তাহলে দস্যু দেখা যাবে! যে কখনও দস্যু দেখেনি, তার দস্যু জিনিষটা কেমন দেখতে এটা জানার ইচ্ছে তো হবেই।

আমি লুকিয়ে পড়লুম, কিন্তু ছেলেটি যেখানে আগে বসেছিল, আবার সেখানেই বসে পড়লো। আবার বেহালাটা বাজাতে লাগলো।

ততক্ষণে দস্যুরা সেখানে হাজির। ওদের চেহারা আমি দেখতে পেয়েছি। ঘোড়ার পিঠে ছুটে আসছে। আগাগোড়া বিচ্ছিরি কালো রঙের পোষাক পরে আছে। চোখগুলো কালো কাপড়ের ঢাকনি দিয়ে এমনভাবে মোড়া, তুমি শত চেষ্টা করলেও ওদের চোখ দেখতে পাবে না। কিন্তু ওরা তোমায় ঠিক দেখতে পাবে। সক্কলের কাঁধে একটা করে বন্দুক। দলে ক'জন আছে আমি বলতে পারবো না। কিন্তু অনেকজন।

বাজনার শব্দটা শুনেই বোধ হয় ওরা ঘোড়া দাঁড় করালো। তারপর ঘুরে ঘুরে খুঁজতে লাগলো। খুঁজতে কতক্ষণ লাগবে? ওতো সামনেই বসে আছে। একজন দস্যু ছেলেটিকে প্রথম দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল। সবাইকে ডেকে বললে, "আরে! একে তো এখনও বাঘে খায়নি! এখনও তো বেঁচে আছে!"

ছেলেটি কিন্তু ওদের কথা কানেই নিলো না। সে যেমন বাজাচ্ছিল, তেমনিই বাজাচ্ছে!

একজন দস্যু ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কাছে এগিয়ে গেল। ক্যার-কেরে গলায় জিগ্যেস করলে, "এই, এখানে কী করছিস?"

ছেলেটি তোয়াক্কাই করলে না।

একজন হঠাৎ ওর পা দুটো দেখতে পেয়েছে। চেঁচিয়ে

Scanned with CamScanner

উঠলো, "আরে! পায়ের শেকলটা তো পায়ে বাঁধা নেই! খোলা পড়ে আছে!"

সত্যিই শেকলটা ওর পাশেই পড়ে ছিল।

হঠাৎ দস্যুটা ওর হাত থেকে বাজনাটা কেড়ে নিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ভাঙেনি রক্ষে! তারপর ওর ঘাড়টা ধরে টেনে তুললে। জিগ্যেস করলে, "পায়ের শেকল খুলেছিস কেন?"

ছেলেটি এতক্ষণে কথা বললো। বললে, "বেশ করেছি!"

আমি অবাক হয়ে গেলুম ওর কথা শুনে। দারুণ তেজিয়াল ছেলে তো! একটুও ভয় পেলো না!

আমি বুঝতে পারলুম, দস্যুটা ওর কথা শুনে ভীষণ খেপে গেছে। ঘাড়টা ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিলে। বললে, "মুখের ওপর কথা! সাহস তো কম নয়! মেরে দাঁতগুলো উপড়ে ফেলবো!"

ছেলেটি উত্তর দিলে, "আমিও দাঁত উপড়ে নিতে পারি!"

ছেলেটির কথা শুনে দস্যুটা কী রকম ঘাবড়ে গেল! থতমত খেয়ে গেছে! সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে আর একটা দস্যু চেঁচিয়ে বললে, "দে না, একদম খতম করে দে!"

"তাই দেব," বলে যেই দস্যুটা ওর ঘাড় ছেড়ে, নিজের কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়েছে, ছেলেটিও মাটির থেকে লোহার শেকলটা তুলে নিয়েছে। হাত ঘুরিয়ে চোখের নিমেষে ধাঁই করে ওর মুখের ওপর মেরে দিয়েছে। লোকটা ছিটকে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। কী দুর্দান্ত সাহস!

কিন্তু এবার তো ওর নিশ্চয়ই বিপদ! এবার ওকে নিশ্চয়ই মারবে! কিন্তু মজা কী, মারবার আগে ও নিজেই চেঁচিয়ে উঠলো, "আয়, আয়, দেখি তোদের কতো সাহস!" বলে সেই লোহার শেকলটা বন বন করে ঘুরিয়ে এগুতে লাগলো। ঘোড়াগুলোও ভয়ে পিছু হটছে। তা বলে তো আর লোহার শেকল ঘুরিয়ে বন্দুকের গুলি আটকানো যায় না! দস্যুরা ঝটপট বন্দুক তুললে। আমি দেখলুম ওর এবার নির্ঘাৎ মরণ!

ওরা বন্দুক ছোড়ার আগেই ঝোপের ভেতর থেকে আমি হঠাৎ হুংকার ছাড়লুম, "হালুম!"

থমকে গেল ওদের বন্দুক। চমকে উঠলো ওদের বুক। ওরা কিছু বুঝতে না বুঝতেই, আমি দস্যুদের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়লুম। ওরা ভয়ে মরা-কান্না কেঁদে উঠলো। ঘোড়াগুলো চার পা তুলে লাফাতে লাগলো। আমি এক-একটা থাবা মারি আর এক-একটা দস্যু মাটির ওপর চিৎপাত হয়ে লুটিয়ে পড়ে! আমার গর্জন, ওদের চিৎকার আর ঘোড়াগুলোর চিঁহিঁ-চিঁহিঁ ডাক, সব মিলিয়ে তখন যেন সেখানে কুরুক্ষেত্র! আমি বেশ মনে করতে পারছি, সেদিন সব কটা দস্যুকে আমি খতম করে দিয়েছিলুম। সব কটার বন্দুক হাত থেকে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল। আর ঘোড়াগুলো, কোনটা মরেছে, কোনটা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে আর কোনটা এদিক ওদিক ছুটে ছুটে পালাচ্ছে। এই সুযোগে একটা কিন্তু কাণ্ড ঘটে গেল। একজন দস্যু আমাকে ফাঁকি দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে দে চম্পট। আমার নজর এড়ায়নি। আর এই ব্যাপারটাই যে সাংঘাতিক বিপদ ডেকে আনবে, আমি সেটা তখনই বুঝতে পেরেছিলুম। বুঝলে কী হবে! আমি তো কথা বলতে পারি না। আমি তো ছেলেটিকে বলতে পারিনি, এখানে আর থাকা উচিত নয়। আর যদিও বলি, ও আমার কথা শুনবে কেন? ও কি **এখান** থেকে মাকে ছেড়ে যাবে?

দস্যুগুলোকে হারিয়ে দিয়ে জেতার গর্বে আমার বুকটা ফুলে ফুলে উঠছিল। আর এমন একজন সাহসী ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পেরে আমার যে কী আনন্দ, বলতে পারছি না। বীরের সঙ্গে বীরেরই পোষায়! ল্যাদাড়ুস ল্যাংচা-মার্কাদের নিয়ে কাজ হয়!

আমি হাঁপাচ্ছিলুম। হাঁপিয়ে একটু গেছলুম। ছেলেটি ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলে। আমায় আদর করলে। আমিও আমার এই হাঁড়ির মতো মস্ত মুখটা দিয়ে ওর গালটা ঘসে দিলুম।

ছেলেটি খুশিতে ছুটে গিয়ে ওই মরা দস্যুদের বন্দুকগুলো তাড়াতাড়ি তুলে নিয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখলে। বললে, "কোনদিন আর যদি কেউ আসে, এই বন্দুক দিয়ে তাকে শেষ করবো!"

আমি জানতুম, যদি কেন, নিশ্চয়ই আসবে। কারণ, যে-দস্যুটা পালিয়েছে, সে কী তার দলবলকে এ-কথা বলবে না? দস্যু-সর্দার হুড্ডা-গুড্ডা কী ছেড়ে কথা বলবে? ওই দস্যুটা ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে আমার তাই এতো আফ্‌শোষ হলো! আমায় বোকা বানিয়ে দিলে! আমিই বা কী করবো! একা সকলের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। ব্যাপারটা তো চারডিখানি নয়! তার ওপর সব্বার হাতে বন্দুক। একবার চালিয়ে দিলেই হলো! কিন্তু সেই সুযোগ কাউকে দেওয়া চলবে না। সুতরাং হাওয়ার মতো ছুটে ছুটে আমায় কাজ করতে হয়েছিল। এখন সেই ফাঁকে কেউ পালালে, আমার বরাত ছাড়া আর কী বলবো!

বন্দুকগুলো যখন সব ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ফেললো ছেলেটি, তখন বেহালাটা আবার তুলে নিলো। ভালো করে পরখ করলো। নাঃ, ভাঙেনি। আমায় বললে, "আয়, এবার তোকে বেহালা বাজাতে শিখিয়ে দিই।"

সত্যি বলছি, আমার তখন ওই বেহালা-টেহালা বাজাবার মতো মনের অবস্থা নয়। মন তখন পড়ে আছে অন্যখানে। ভয় হচ্ছে, দস্যুরা এবার না লুকিয়ে লুকিয়ে চলে আসে। কিন্তু ছেলেটির কথা না শুনলে ও যদি দুঃখু পায়! সত্যিই, ওকে দুঃখু দিতে কষ্ট লাগে! আর সেই কথা ভেবেই, ইচ্ছে না

থাকলেও, বেহালা শিখতে আমি আপত্তি করলুম না। ওর পাশে গিয়ে বসলুম।

ছেলেটি বললে, "প্রথমে তোকে সা-রে-গা-মা শিখিয়ে দিই।"

তোমাকে তো আগেই বলেছি আমি বাঘ। ওই হাসি-টাসি ব্যাপারগুলো আমার ধাতে সয় না। কিন্তু সা-রে-গা-মা কথাটা শুনে আমার হঠাৎ এমন মজা লাগলো! মনে হলো, কে যেন হাসিয়ে দেবার জন্যে আমার পেটে কাতুকুতু দিয়ে দিলে। যে হাসতে জানে না, তার কাতুকুতু লাগলে যে এমন দুর্দশা হবে, আমি তা মোটেই ভেবে পাইনি। আমার মনে হচ্ছিল, হাসিটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবার জন্যে যতই আঁচড়-পাঁচড় করছে, ততই আমার পেটের ভেতরে সেটাকে কে যেন আঁক-পাকিয়ে টেনে ধরে রাখতে চাইছে। সে এক ভয়ানক হেসুড়ে ব্যাপার! হাসি পাচ্ছে অথচ হাসতে পারছি না!

শেষকালে ফট করে পেটের ভেতর থেকে ফস্কে হাসিটা মুখ দিয়ে হা-হা-হা শব্দে বেরিয়ে এলো। আমি হেসে ফেললুম। বাঘের হাসতে সত্যি মানা কিনা জানি না। কিন্তু একবার যখন হেসে ফেলেছি, তখন সেটাকে থামাবার চেষ্টা না করে, হাসতে-হাসতেই বেহালায় সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি শিখতে লাগলুম।

বেশিক্ষণ হাসতে হলো না। সা-রে-গা-মা-ও শিখতে হলো না। যা ভেবেছি তাই! আবার ঘোড়া ছুটে আসছে! শব্দ পাচ্ছি! এইবার নির্ঘাৎ বিপদ! ছেলেটিও শুনতে পেয়েছে। এবার যেন অনেক ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ছেলেটি চটপট বেহালাটা অন্ধকারে সরিয়ে রেখে আমায় বললে, "ওরা নিশ্চয়ই আবার আসছে! তুই লুকিয়ে পড়!" বলে নিজে ছুটে চলে গেলো দস্যুদের সেই বন্দুকগুলো যেখানে লুকিয়ে রেখেছিল, সেই ঝোপের মধ্যে। আর আমিও লুকিয়ে পড়লুম একটা মস্ত ঝাঁকড়া গাছের আড়ালে।

দেখতে দেখতে দস্যুর দল সেখানে হাজির। এবার একজন-দুজন নয়। অগুনতি। এবার ওদের সঙ্গে লড়া, আমার একার কম্ম নয়। কারণ, এবার ওরা তৈরি হয়ে এসেছে। বাহাদুরি দেখাতে গেলে, নিস্তার নেই!

দস্যুগুলো সামনে এসে দাঁড়ালো। অন্ধকার রাত্তির বলে ঠাওর করতে ওদের মুশকিল হচ্ছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে ঝটপট নেমে পড়লো। একটু আগে যে-দস্যুগুলোকে আমি মেরে ফেলে রেখেছি, সেগুলোকে নেড়েচেড়ে দেখলে। যদি কেউ বেঁচে থাকে! যখন দেখলো কেউ বেঁচে নেই, তখন বন্দুক উঁচিয়ে সেই জায়গাটা ঘিরে ফেললে। খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো।

"গুড়ুম!" হঠাৎ বন্দুক গর্জে উঠলো। আমি ঠিক দেখতে পেলুম, ছেলেটি যে ঝোপটার ভেতরে বসে আছে, সেখান থেকে গুলি ছুটে এসে একটা দস্যুর বুকে বিঁধেছে। চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো দস্যুটা। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলে ঝপা-ঝপ মাটিতে শুয়ে পড়লো। বন্দুক উঁচিয়ে, হামাগুড়ি দিতে দিতে ওই ঝোপের দিকে এগিয়ে চলেছে তারা। আবার ঝোপের ভেতর থেকে শব্দ এলো, "গুড়ুম!"

"গুড়ুম! গুড়ুম!" দস্যুরাও বন্দুক ছুড়লে।

তারপর ঝোপের ভেতর থেকে আর দস্যুদের বন্দুক থেকে শব্দ আর শব্দ, "গুড়ুম! গুড়ুম!" সত্যিকারের একটা যুদ্ধ লেগে গেল দস্যুদের সঙ্গে ছেলেটির।

কতক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলেছিল, আমি বলতে পারবো না। জানি না, যুদ্ধে কটা দস্যু মরেছিল। কিন্তু খানিকপরেই ছেলেটির বন্দুক থেমে গেল। তখনই আমার ভয় হয়েছিল, বন্দুকের গুলি বোধহয় ফুরিয়ে গেছে!

আমার কথা মিথ্যে নয়! এবার দস্যুর দল আগের মতোই মাটি কামড়ে গুঁড়ি সুঁড়ি মেরে চারিদিক থেকে ওই ঝোপের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ঝোপ ছেড়ে ছেলেটি ছুটতে গেল, কিন্তু পারলো না। ছেলেটিকে দস্যুর দল হ্যাঁচড়া-টানে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে, ছুট দিলে। ছেলেটি হাত-পা ছুড়ে ছটফটিয়েও আর ছাড়ান পেলো না। একবার মনে হয়েছিল, আমি লাফিয়ে পড়ি ওদের ওপর। সাহস হলো না। ভেবেছি, হট করে এমন কাজ করাটা ঠিক না। তাহলে আমাকেও মরতে হবে। তুমি হয়তো আমার এ-কথা শুনে ভাবছ, "আমি একের নম্বরের ভীতু। ভীষণ স্বার্থপর।" ভাবতে পার। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখলে ভালো করবে। অনেক সময় খামোকা গা-জোয়ারী করার চেয়েও, বুদ্ধির জোরে কাজ হয় অনেক বেশি। তাই ওরা যখন ছেলেটিকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে ছুট দিলে, আমিও তখন গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছি। ওই যে বেহালাটা মাটিতে পড়েছিল, ওটা মুখে তুলে নিয়ে নিঃসাড়ে ঘোড়ার পেছনে আমিও ছুট দিয়েছি।

একটা যে বাঘ ওদের পেছনে পেছনে ছুটছে, এটা কিন্তু ওরা খেয়ালই করেনি। ওরা জানতে পারলো না, ওদের পেছনে যম। জানতে পারা সম্ভবও নয়। কারণ, ওরা তখন শিকার ধরে জয়ের আনন্দে দিশেহারা। আর আমি তখন শিকার ধরবার জন্যে সাবধানে তাদের পেছনে লাফিয়ে ছুটছি।

ছুটতে ছুটতে ওরা বন পেরিয়ে গেল। বোধহয় শহরে পড়লো। বিপদ আমার। কেননা, বন-জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শহরে তো তা হবার যো নেই। পরিষ্কার ঝরঝরে রাস্তা ঘাট। লুকুবার জায়গা-ই নেই। আমি চেয়ে দেখি, ঠাকমা যেমন আমায় বলেছিল, শহরটা ঠিক তেমনি। এ-পাশে ও-পাশে বড় বড় কোঠা বাড়ি। কিন্তু রক্ষে এই, তখন নিঃঝুম রাত্তির। লোকজন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তা-ঘাট ফাঁকা।

আমি দেখলুম, ছেলেটিকে জাপ্টে ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে দস্যুর দল একটা মস্ত বাড়ির ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বাইরে থেকে বাড়ির চেহারা দেখে আমার বুঝতে বাকি রইলো না, এইটা রাজপ্রাসাদ। ওরা তো ঢুকে গেল গটগটিয়ে। কিন্তু বাঘ কেমন করে ঢুকবে? চোরের মতো আর সকলের চোখ এড়িয়ে টুপ করে তো আর ঢুকে পড়তে পারবো না! আমার চেহারাটা যদি ছোট-খাটো হতো, তা হলে ভাবনা ছিল না। এই পেল্লাই দেহটা নিয়ে অন্যের চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুখের কথা নয়! তার ওপর আবার ফটকের সামনেও বন্দুক উঁচিয়ে দু-দুজন দস্যু-পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে। এই সময় আমি বাঘ না হয়ে, বাঘের মাসী হলে ভালো হতো!

আমার মাসীকে আমি কখনও দেখিনি। শুনেছি, আমার মাসীর চেহারাটা খুব ছোট্ট-খাট্টো! মাসী আমার রান্না-ঘরে, ভাঁড়ার-ঘরে হুট হুট করে ঢুকে পড়তে পারে। মাছটা, দুধটা উল্টে-পাল্টে খেয়ে ফেললেও কেউ জানতে পারে না। আমার মাসীকে অবশ্য তোমরা সবাই চেনো। অনেকে আদর করে ঘরে পোষ মানাও। ভালোবেসে ডাক দাও, "মিনি-মিনি-মিনি!"

কিন্তু সে তো হলো। এখন তো যাহোক করে আমাকে রাজপ্রাসাদের ভেতরে যেতেই হয়। দেরি হয়ে গেলে, ছেলেটিকে হয়তো আর আস্তই রাখবে না। যেমন করে হোক তাকে বাঁচাতেই হবে। এখন ঝঞ্ঝাট আমার এই বেহালাটা নিয়ে। বাজনাটাকে কোথাও লুকিয়ে না রাখলে বাজনাটাও যাবে আর আমারও অসুবিধে। কিন্তু রাখি কোথা?

এখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সামনের দিকে নজর পড়তে দেখি, রাজপ্রাসাদের প্রায় সামনা-সামনি একটা বেশ উঁচু বাড়ি। ইচ্ছে করলে, এই বাড়িটার ছাতে উঠে পড়া যায়। সেই ভালো!

Scanned with CamScanner

রাতদুপুরে বাড়ির লোকজনেরাও সবাই ঘুমিয়ে আছে। এই তাল। আমি এগিয়ে গেলুম। সাঁই করে বাড়ির পাঁচিলে লাফ দিলুম। পাঁচিলের ওপর ডিঙি মেরে ছাতের ওপর টপকে উঠে পড়লুম। ছাতের এইখানে, এই কোণে বেহালাটা লুকিয়ে রাখলে কেউ দেখতে পাবে না। বেশ ঘুপচি। আমার মুখ থেকে নামিয়ে বেহালাটা এইখানেই রেখে দিলুম।

ছাতটা সত্যিই বেশ নির্ঝঞ্ঝাট। আমি এখানে দিনের পর দিন যদি ঘাপটি মেরে বসে থাকি, তা হলেও কেউ দেখতে পাবে না। অথচ আমার সব কিছু দেখতে অসুবিধে নেই। অন্ধকারেও রাজপ্রাসাদটা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে, রাজপ্রাসাদের গা বরাবর একটা মস্ত ঝিল। জল চিকচিক করছে। অবশ্য দেখতে পাচ্ছি রাজপ্রাসাদের বাইরেটা। ভেতরে কী হয় না হয় মা ভগায়-ই জানে। আমার কিন্তু মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। ছেলেটিকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে কী করলো কে জানে!

ঝটপট আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। মনে হলো, অন্তত ওই ফটকের পাহারাদার দুটোকে যদি শেষ করে ফেলতে পারি, তাহলে ফটক পেরিয়ে প্রাসাদের ভেতরে তো ঢোকা যায়! কিন্তু আমি জানতুম না, ভেতরেও অগুনতি পাহারাদার। না-জেনেই আমি আবার ছাত থেকে লাফ মেরেছি। গুঁড়িসুঁড়ি মেরে ফটকের সামনে হাজির হয়েছি। ওরা তো আনমনে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় দেখতে পাওয়ার সুযোগই দিলুম না। ধাঁই করে একটার ওপর মেরেছি লাফ। একটি থাপ্পড়েই বাছাধন ছিটকে পড়ে অক্কা গেল। আর একজন সেই দেখে পালাতে যাবে কী, আমি তার টুঁটিটা টিপে ধরতেই, তিনি আর মা বলবার সময়ই পেলেন না। দুটোকেই ওখান থেকে চটপট সরিয়ে ফেললুম। পাশের ঝিলটার মধ্যে টেনে নিয়ে ফেলে দিলুম। জলের ভেতর দুজনেই ডুবে রইলো। দেখলুম, ঝিলের জল ওদের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। ওদের যেখানে মেরেছিলুম সেই রাস্তাটা, ফটকের সামনেটাও তাদের রক্তে যে লাল হয়েছিল, সেটা অবশ্য আমি দেখবার সময় পাইনি। কেননা, ওদের ঝিলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেই আমি রাজপ্রাসাদের ফটকের মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

ফটক পেরিয়ে দেখি, সামনে ইয়া লম্বা-চওড়া একটা চত্বর। এমন খোলামেলা যে গা-ঢাকা দেওয়া অসম্ভব। তার ওপর চত্বরেও দেখি, জনা পাঁচেক দস্যু বন্দুক নিয়ে ঘোরা ফেরা করছে। দেখে মনে হলো, আমি যে ওদের দুজন সঙ্গীকে খতম করে ফেলেছি, ওরা সেটা টেরই পায়নি। রাতটা অন্ধকার বলে তাই। তা না-হলে জেনে রাখো, ওরা আমায় নির্ঘাৎ দেখে ফেলতো! তারপর কী হতো, সে তো বুঝতেই পার! এগিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে বলে মনে হলো না। অগত্যা আমি চত্বরের একটি কোণে জুজুবুড়ির মতো বসে রইলুম! দেখতে পেলুম রাজবাড়ির ওপর দিকে বারান্দাটা একদম ফাঁকা। ইচ্ছে করলে লাফ মেরে উঠে পড়তে পারি। ওখানে উঠে, লুকিয়ে থাকলে কেউ কিস্সু বুঝতেই পারবে না। কিন্তু, আসলে আমি তো লুকিয়ে থাকতে আসিনি। ছেলেটিকে উদ্ধার করতে এসেছি। আশ্চর্য, তার তো কোন পাত্তাই নেই!

এমন সময় হঠাৎ যেন বাইরে একটা কাক ডেকে উঠলো। একটা ডাকলো বলে সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ডাকলো। তারপর এমনি করে একটি দুটি ডাকতে ডাকতে অনেক কটি কা-কা সুরু করে দিলে। আমি একদম বুঝতে পারিনি, এতো তাড়াতাড়ি রাত কেটে ভোর হয়ে আসছে। এইরে! এইবারেই তো বিপদ! আমি একেবারে বুদ্ধু বনে গেছি। আমার মাথায় একবারও এলো না, রাতের অন্ধকার চিরটা কাল ধরে আকাশের গলা জড়িয়ে বসে থাকবে না। আলো আসবেই। নাঃ, আর বোধহয় ছেলেটিকে বাঁচাতে পারলুম না। দিনের আলো স্পষ্ট ফোটার আগেই এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। কিন্তু কোথায় যে কাটবো, জানি না।

ঠাকমার মুখে শুনেছি, শহরটা গাঁ-ঘরের মতো নয়। গাঁ-ঘরে লোকজন কম। গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাড় আছে। তবু লুকিয়ে থাকা যায়। কিন্তু শহরে সেটি হবার যো নেই। এক্ষুনি ঘুম ভাঙলেই সব হৈ হৈ করে বাইরে বেরিয়ে পড়বে। মাঠে, ঘাটে, বাজারে লোকে লোকে ছয়লাপ হয়ে যাবে।

আমি বেরিয়ে পড়লুম রাজপ্রাসাদ থেকে। ভাবলুম, আবার কী ছুট দেব! কিন্তু কোনদিকে ছুটবো, কোথায় ছুটবো? রাস্তা-ঘাট কিচ্ছু চিনি না। আমার সব গুলিয়ে গেছে। আমি এখন ভীষণ প্যাঁচে পড়ে গেছি।

বলতে বলতেই হাত-পা কেঁপে উঠলো। সাংঘাতিক ব্যাপার। দেখি, রাস্তায় একটি দুটি লোক হাঁটাহাঁটি সুরু করে দিয়েছে। এখানে দাঁড়িয়েই বা থাকি কী করে?

মাথায় যখন কোন বুদ্ধি আসছে না, তখন যে বিপদ আমার ঘাড়ের ওপর এক্ষুনি লাফিয়ে পড়বে, সেটুকু বুঝতে পারছি। তাই আগু-পিছু না ভেবে, যে-ছাতে বেহালাটা লুকিয়ে রেখে এসেছি, সেইখানেই আবার লাফিয়ে উঠে লুকিয়ে রইলুম। অন্তত এখনকার মতো তো থাকা যাক। তারপর দেখা যাবে।

ভাগ্যি ভালো যে, এই বাড়ির এখনও কারো ঘুম ভাঙেনি। তাই আমিও নির্ঝঞ্ঝাটে উঠতে পেরেছি। ছাতের ওপর উপুড় হয়ে বসে রইলুম।

দেখতে দেখতে আকাশ ফর্সা হয়ে গেল। চারিদিকে লোক-জন চলাফেরা সুরু করে দিলে। কথা-কওয়া, চান-খাওয়া, অফিস-যাওয়া চালু হল। ফ্যাসাদ কাকে বলে! আমি মশাই নাস্তানাবুদ! তুমি হয়তো বলবে, "কী দরকার ছিল তোমার অমন বাহাদুরি দেখানোর? ছেলেটার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে লাভটা কী হলো? বাঘের ছেলে, বাঘের মতো, বাঘের বনেই

Scanned with CamScanner

থাকলে পারতে! এখন কেমন জব্দ!"

তা বলতে পারো জব্দ হয়েছি। তা নইলে বাঘ বলে বাঘ, সে কিনা ছাতের কোণে লুকিয়ে বসে আছে! লোকে শুনলে দুয়ো দেবে না? তাছাড়া এই চৌদিক ফাঁকা ছাতের ওপর, একটা ধুমসো বাঘ কতক্ষণই বা চোরের মতো বসে থাকতে পারে? নিজেরই এখন নিজেকে ছ্যাঃ ছ্যাঃ বলে ভেংচাতে ইচ্ছে করছে। ওদিকে যার জন্যে এতখানি ছুটে আসা, ধড়িবাজ দস্যুর দল এখনও তাকে আস্ত রেখেছে বলে মনে হয় না। কারণ এখান থেকে বসে বসে রাজপ্রাসাদের মধ্যে কী হচ্ছে, না হচ্ছে, তা জানার তো কোনই উপায় নেই। তবে এখন এটাকে রাজপ্রাসাদ না বলে সিধেসিধি দস্যু-প্রাসাদ বলা ভালো। কেননা, প্রাসাদটা তো এখন রাজার নয়। রাজাকে বন্দী করে, রাজপ্রাসাদটা কেড়ে নিয়ে, গোটা রাজত্বটাই এখন হুন্ডা-গুন্ডা দখল করে বসে আছে। তাই বলতে পারো, এখন হুন্ডা-গুন্ডাই এখানকার রাজা। তাই-ই হয়! তুমি ভালো হও, চাই নাই হও, তোমার বুদ্ধি থাকুক আর নাই থাকুক, তোমার কাছে বন্দুক, গোলা, কামান থাকলেই হচ্ছে। দুম-দাম, গুড়ুম-গুড়ুম ছুড়বে, দেখবে জবরদস্ত রাজা-উজিরও ল্যাজ নাড়তে নাড়তে তোমায় খাতির করবে। তোমাকে মাথায় নিয়ে নাচানাচি করবে।

এ-সব মানুষের বেলায়। তবে আমাদের ওটি পাবে না। ওই তো আমার বুড়ি ঠাকমা। ইচ্ছে করলে তো গায়ে পড়ে মানুষের সঙ্গে ভাব করতে পারতো। করলে তা? উল্টে মানুষের গুলিতে বীরের মতো প্রাণ দিলে। আর আমি? আমার কথা ধরো। এইতো আমার পিঠে গুলির দাগটা এখনও দগদগে হয়ে আছে। ঠিক কথা রক্ত পড়া থেমেছে। কিন্তু এখনও তো একটু একটু জ্বালা আছে। তাই বলে কী আমি পা জড়িয়ে মানুষের খোসামোদি করতে গেছি। বয়ে গেছে! আমি বাঘের ছা। ও ধাতুতে আমরা গড়া নই।

একটু একটু ঘুম পাচ্ছে। তার মানে আমার ভয় কেটে গেছে। তুমি দেখো, ভয় যখন পায়, তখন ঘুম পায় না। আর ঘুম যখন পায়, তখন ভয় পায় না। ঘুমের আর দোষ দেব কী! কাল রাত থেকে যা ধকল যাচ্ছে। মরতে মরতে বেঁচে গিয়ে, শেষে ছেলেটার পাল্লায় পড়ে এমন জড়িয়ে গেছি! জড়ানো উচিত ছিল না। কিন্তু বাঘ হলেও আমার তো একটু-আধটু দয়া-মায়া থাকতে পারে! মোদ্দা কথাটা ভুলো না কেউ, আমার জন্ম একটা খাঁটি আর সত্যিকারের রাজবংশে! তার মানে, আমাকে তুমি জানোয়ার বলতে পারো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে হবে, আমি বনের রাজা!

"দুম!" কী সাংঘাতিক শব্দ! ভাবা যায় না, এই সক্কাল-বেলা এমন একটা শব্দ আচমকা অমন করে ফেটে পড়বে। সত্যি বলছি, আমি চমকে উঠেছি। আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিল ভয়ংকর। ছাতের আলসের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ঘোড়ার পিঠে দস্যু। একটা বোমা ফেটেছে ঠিক রাজবাড়ির ফটকের সামনে। ধোঁয়ার কুন্ডুলি পাক খেতে খেতে আকাশে উঠছে। সারাটা জায়গা অন্ধকার। দেখো, রাস্তার লোকগুলো চিল-চেঁচাতে চেঁচাতে কী রকম পাঁই পাঁই করে ছোটা দিয়েছে। আবার বোমা ফাটলো, "দুম! দুম!" দস্যুর দল ঘোড়া ছুটিয়ে হল্লা সুরু করে দিলে, "হাট যাও, হাটো, হাটো।" রাস্তার লোকেরা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পগারপার! কী ব্যাপারটা কী? তাহলে কি কাল রাতে যে দুটো পাহারাদারকে মেরেছি, তার খবর পেয়ে দস্যুর দল খেপেছে!

চক্ষের নিমেষে রাস্তা-ঘাট সব খাঁ খাঁ। যে যেদিকে পারলো ভেগে পড়লো। ঘর-দোর সব বন্ধ হলো। ঘোড়সওয়ার দস্যু-গুলো ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে লাফিয়ে তান্ডব নাচ সুরু করে দিলে। ওদের হালচাল দেখে মনে হচ্ছে, যে এদিকে আসবে কিম্বা যে জানলা-দরজা খুলবে, তার বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। এতো আচ্ছা রাজার রাজত্ব! বটেই তো! রাজত্বটা এখন কার দেখতে হবে তো! রাজার নাম, দস্যু-সর্দার হুন্ডা-গুন্ডা!

আমি তো এতক্ষণ ধরে ছাতের ওপর চুপটি করে বসে ঘোড়ার পিঠে দস্যুগুলোর ছোটাছুটি দেখছিলুম আর ওই বোমা-ফাটানো ধোঁয়ার হাত থেকে নিজের চোখ দুটোকে সামলা-চ্ছিলুম। কিন্তু হঠাৎ দেখি কী, ওই ফাঁকা রাস্তার ওপর কটা দস্যু বন্দুক-টন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে। কী রে বাবা! আমায় দেখতে পেলো নাকি! তারপর আরও দেখি কী, দুজন দস্যু, সেই ছেলেটিকে বেশ করে বেঁধে, টানতে টানতে রাজ-প্রাসাদের ফটকের বাইরে নিয়ে আসছে। এতক্ষণ যে এতো বোমা ফাটাফাটি হলো, কিম্বা ঘোড়া ছোটাছুটি করলো, তাতে আমি একটুও ঘাবড়াইনি। কিন্তু হঠাৎ ছেলেটিকে অমনি করে ফটকের বাইরে আনতে দেখে, আমার পা থেকে মাথা অবধি ঠকঠক করে কেঁপে উঠলো। আমি উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লুম। আমার একটিবারের জন্যেও খেয়াল হলো না, কেউ আমায় দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু ভাগ্য বলতে হবে, তখনও পর্যন্ত আমায় কেউ দেখতে পায়নি। ছেলেটিকে টানতে টানতে নিয়ে এসে ওরা খোলা রাস্তায় দাঁড় করালো। আমি দেখলুম একজন বেশ লম্বা-চওড়া দস্যু ভীষণ হম্বি-তম্বি করে ছেলেটার সামনে এগিয়ে আসছে। সবাই তাকে দেখে তটস্থ হয়ে সরে যাচ্ছে, সেলাম ঠুকছে। আমার মনে হলো, ইনিই বোধহয় হুন্ডা-গুন্ডা। ইনিই এখন রাজা।

রাজাই তো। তবে দস্যু-রাজা। রাজার ইসারা মতো ছেলেটির সামনা-সামনি, একটু তফাতে, একজন বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়ালো। এবার আমার কাছে সব ব্যাপারটা জলবৎ তরলং। এখন ওরা ছেলেটিকে এই খোলা রাজপথে গুলি করে মারবে।

লোকটা বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়াতেই হুন্ডা-গুন্ডা চেঁচিয়ে উঠলো, মানে হুকুম চালালে, এক, দো—

আমি তিন বলতে দিলুম না। আমি জানি তিন বললেই বন্দুক ছুটবে, গুড়ুম! আমার মাথায় নিমেষের মধ্যে একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। তিন বলার আগেই পড়ি-মরি বেহালাটা তুলে নিয়ে বাজিয়ে দিয়েছি, টুং-টাং-টিং! বেশ জোরেই তারে টান পড়েছে! হুন্ডা-গুন্ডা থমকে গেছে। মুখে কোন কথা না বলে মিট মিট করে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো। কিন্তু দেখবেই বা কাকে আর বুঝবেই বা কী! তাই আবার হাঁক দিলে, এক, দো—

টুং-টিং-টাং।

হুন্ডা-গুন্ডার গলায় এবার মেঘ ডাকলো, "কোন হ্যায়! বাজনা বাজায় কে?"

সেই ডাক শুনে তো ওর সাঙ্গপাঙ্গদের মুখ শুকিয়ে আমচুর। সবাই ভয়ে ভয়ে এ ওর চোখ চাওয়া-চায়ি করছে। কিন্তু কিছুর হদিশই পাওয়া গেল না। হুন্ডা-গুন্ডা ভাবলো, তার বোধহয় নিজেরই শুনতে ভুল হয়েছে। তাই সে আবার হাঁক পাড়লো, এক, দো—

"হুজুর, বাঘ!" হঠাৎ একজন দস্যু ছাতের দিকে চেয়ে চিৎকার করলো।

এইরে! আমায় দেখতে পেয়েছে!

আর দেখতে আছে! ওর মুখের কথা শেষ হতে দিলুম না। ছাতের ওপর বেহালাটা ফেলে রেখেই নিমেষের মধ্যে মেরেছি লাফ, একেবারে সিধে হুন্ডা-গুন্ডার ঘাড়ের ওপর। ওর টুঁটিটা কামড়ে ধরে ঘাড়টা মটকে দিয়েছি। হুন্ডা-গুন্ডা মাটির ওপর চিৎপটাং। তাই না দেখে আর সব দস্যুগুলো, "মারে," "বাপরে" বলে যে যেদিকে পারলো ছুট দিলো। আমার সঙ্গে পারবে কেন? টপাস টপাস করে একটি একটি ধরছি, আর শেষ করছি। একেবারে লন্ডভন্ড। এমন হুংকার ছাড়ছি, যে ঝাছাদের সেই ভয়েই হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যাচ্ছে। আমি সব তছনছ

Scanned with CamScanner

করে দিয়েছি। কিন্তু সব কটাকে একসঙ্গে শেষ করি কী করে? এতো আর আমার একার দ্বারা সম্ভবও নয়। তখন দেখি কী, ছেলেটি নিজের বাঁধনটা কষ্টে-সৃষ্টে খুলে ফেলেছে। একটা দস্যুর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে, দুম-দাম সে-ও লেগে পড়লো। তাই না দেখে যে পারলো, পালালো। যে সামনে পড়লো, সে মরলো। আমার কী লম্ফঝম্ফ তখন যদি দেখতে। সে যেন একটা সত্যি-সত্যি যুদ্ধক্ষেত্র। অন্তত হাজারটা দস্যুর দেহ মাটিতে পড়ে রক্ত-গঙ্গায় হাবুডুবু খাচ্ছে। আমিও ভীষণ হাঁপিয়ে গেছি। হাঁপাতে হাঁপাতেই তেড়ে-মেড়ে ছোটাছুটি করে খোঁজাখুঁজি করছি।

না, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আর কাউকে দেখছি না। তবু আর একবার হুড্ডা-গুড্ডার দেহটার কাছে এগিয়ে গেলুম। বিশ্বাস নেই, বেঁচেও তো থাকতে পারে! পা দিয়ে ওর গলাটা চেপে ধরতেই, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এলো। লোকটা একদম খতম।

কতক্ষণেরই বা ব্যাপার! এইটুকু সময়ের মধ্যে এখানে যে এমন সাংঘাতিক তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাবে, এটা আগে কে ভেবেছিল? দস্যুগুলো তো জানতোই না। আমি-যে-আমি, ভাবতে পেরেছিলুম? এ যেন সেই বিনা মেঘে বাজ পড়ার মতন।

হঠাৎ এদিক ওদিক চেয়ে দেখি, ছেলেটি তো নেই! বোঁ করে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। তা হলে কী, ছেলেটিকে ওরা ছিনতাই করে নিয়ে পালালো! রাস্তা-ঘাট ফাঁকা। থাকলে দেখতেই পেতুম। এদিক ওদিক ব্যস্ত হয়ে খুঁজলুম। দেখতে পেলুম না। একবার রাজবাড়ির ভেতরটা তো দেখা দরকার! ভেবে রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছি।

কিন্তু তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, দিনের আলোয় রাজবাড়ির ভেতরটা দেখে আমি একেবারে ট্যারা হয়ে গেছি। কী বিরাট আর কী চমৎকার! এক-একটা চত্বর পেরিয়ে এক-একটা মহল। এক-একটা মহলে অগুনতি ঘর। কী সুন্দর সাজানো-গোছানো! ওরই মধ্যে হনহনিয়ে হেঁটে হেঁটে আমি ছেলেটিকে খুঁজতে লাগলুম।

খুঁজে পেলুম না। খুঁজে পাওয়া সম্ভবও না। তবু খুঁজতে খুঁজতে যে-জায়গায় গিয়ে পড়লুম, দেখলুম সেখানে কয়েদখানা। সারি সারি গারদে দেখি, রাজার সেনারা বন্দী হয়ে আছে। আমি দূর থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি। সামনে গেলে বাঘ দেখে যদি ওরা ভয় পায়!

হঠাৎ আবার বন্দুকের আওয়াজ—"গুড়ুম!"

আমি হকচকিয়ে গেছি! কী হলো আবার! আবার বন্দুক ছোটে কেন? তখনই আমি হঠাৎ ছেলেটিকে দেখতে পেলুম। দেখলুম তার হাতে বন্দুক। ছুটতে ছুটতে গিয়ে ও কয়েদখানার দস্যু পাহারাদারের বুকে গুলি মেরে দিয়েছে। পাহারাদার মাটির ওপর লুটিয়ে পড়েছে। ছেলেটি পাহারাদারের ট্যাঁক থেকে ঝটপট চাবির গোছাটা টেনে বার করে নিলে। গারদের ফটকটা খুলে ফেলে "বাবা" বলে চিৎকার করে উঠলো। ওই গারদে দস্যুর দল ওর বাবাকে বন্দী করে রেখেছিল! ওর বাবার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ছেলেটি। আমি দূরেই, ওদের চোখের আড়ালে রইলুম। আমি দেখতে পেলুম ওর বাবা ওকে বুকে তুলে নিয়ে গারদ থেকে বেরিয়ে আসছে। ছেলেটি বাবার গলা জড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে। আমি এতটা দূর থেকে ঠিক দেখতে পাইনি, ছেলের কান্না দেখে ওর বাবার চোখেও জল এসেছিল কিনা। তবে দেখলুম, ওর বাবা ছেলের হাত থেকে সেই চাবির গোছাটা নিয়ে একটি একটি করে কয়েদখানার সব কটি ফটক খুলে ফেললে। অমনি সেই বন্দী সেনারা আনন্দে চিৎকার করে কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে এলো দলে দলে। রাজপুত্তুরের জয়ধ্বনি দিতে দিতে খুশিতে নাচতে

বাঙালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহক

পশ্চিম বাংলার তাঁতবস্ত্র

সব ঋতুতে সব উৎসবে ব্যবহার করুন

বিভিন্ন রুচির আকর্ষণীয় তাঁতবস্ত্রের প্রাপ্তিস্থান :

+ গভর্ণমেন্ট সেলস এম্পোরিয়ম

১। ৭/১, লিণ্ডসে স্ট্রীট; ২। ১২৮/১, বিধান সরণী;
৩। ১৫৯/১/এ, রাসবিহারী এভেন্যু

+ দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-৪
এবং অন্যান্য অনুমোদিত সমবায় বিপণীতে

পশ্চিম বাংলার তাঁতবস্ত্র উৎকর্ষে এবং বয়নবৈচিত্র্যে অতুলনীয়

পঃ বঃ কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্প অধিকার প্রচারিত

লাগলো।

ওরা যখন আনন্দে দিশেহারা, আমি তখন মনে মনে ভাবলুম, আর তো এখানে থাকা ঠিক নয়! মানে মানে কেটে পড়তে হয়!

আমি কেটেই পড়লুম। আমি আবার পাশের বাড়ির ছাতে উঠে পড়েছি। বেহালাটা নিলুম। নিয়ে ভাবছি এখন কী করা যায়! ঝট করে একটা বুদ্ধি এসে গেল আমার মাথায়। আচ্ছা, এখন এ-বাড়ির ছাতে লুকিয়ে না থেকে রাজবাড়ির ছাতে উঠে পড়লে তো হয়! আমি তো জানি, এক্ষুনি ছেলেটি আমায় খুঁজবে!

বাঘ দেখে, দস্যু দেখে আর বোমা-গুলির দুম-দাম আওয়াজ শুনে শহরের লোকেরা সেই যে ঘরে খিল এঁটেছে, আর বেরুবার নামটি নেই। রাস্তা-ঘাট খাঁ খাঁ করছে। যেন মরুভূমি! আমিও তাই এই তালে এই ছাত থেকে লাফ দিয়ে রাজবাড়ির পেছনদিকে ছুটে গেছি। রাজবাড়ির পেছনদিকের পাঁচিল বেয়ে, এক তোলা, দো তোলা টপাক টপকে যখন ছাতে পৌঁছুলুম, ভাগ্যি ভালো, আমায় কেউ দেখতে পায়নি! দেখবেই বা কেমন করে! তখন কয়েদখানা থেকে মুক্তি পেয়ে রাজার সেনারা, রাজবাড়ির দাস-দাসীরা আনন্দে এমন মশগুল যে, বাঘ নামে এই মস্ত জন্তুটার চেহারা তখন ওদের নজরেই পড়লো না। তাছাড়া আমিও কী অতো বোকা, যে চট করে ওদের দেখা দিয়ে বসে থাকি! আমি জানি কেমন করে খুব সাবধানে সবার নজর এড়িয়ে কাজ করতে হয়।

ছাতে উঠে কান পেতে শুনি রাজবাড়ির ভেতরে তখনও ভীষণ হৈ-হল্লা চলছে। আমার তখন মনে হলো, এখন একটু মজা করলে তো হয়! এই কথাটা ভেবেই আমি আবার বেহালা বাজাতে সুরু করে দিলুম। এবার টুং-টাং-টিং নয়। তুমি শুনলে অবাক হয়ে যাবে, আমি রীতিমতো সা-রে-গা-মা বাজাতে সুরু করে দিয়েছি। আর সেই সা-রে-গা-মা-র সুরটা যতই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, রাজবাড়ির হৈ-হল্লাটা ততই থমকে থমকে থিতিয়ে এলো। তারপর একেবারে চুপ! আমি তখন ঠিক শুনতে পেলুম, বাজনদারকে খুঁজে না পেয়ে ছেলেটি চিৎকার করছে, "আমার বাঘ বাজনা বাজাচ্ছে। আমার বাঘ কোথা গেল?"

আমি তো পাকা ওস্তাদের মতো একমনে বাজনায় মশগুল। এদিকে কখন যে বাবার হাত ধরে শহরের রাজপুত্তুর বনের রাজপুত্তুরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আমি তা দেখতে পাইনি। ও ছুটে এসে, আনন্দে আমার পিঠের ওপর লাফিয়ে বসলো। আমার পিঠের সেই গুলি-বেঁধা জায়গাটা যদিও হঠাৎ একটু ব্যথিয়ে উঠেছিল, তবু আমি তাকে নিয়ে নাচতে সুরু করে দিলুম। তার হাতে বেহালাটা তুলে দিলুম। সে আমার পিঠে বসেই বাজনার সুর ধরলে। আমি তাকে পিঠে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ছাত থেকে নেমে এলুম। রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। ছেলেটি আমার পিঠে বসে বাজনা বাজায় আর আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকি।

এতো চেনা বাজনার জানা সুর। এ শহরের সবাই তো আগে রাজপুত্তুরের বাজনা শুনেছে। তাই চেনা-চেনা বাজনা শুনে, চেনা মুখটি দেখার জন্যে সবাই একটু একটু দরজা ফাঁক করলো। সবার চোখে বেবাক চাউনি! বাঘের পিঠে বসে রাজপুত্তুর! নিজেদের চোখকে নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছে না! এতদিন তারা হুজ্জা-গুজ্জার কবলে পড়ে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছিল। তাই আজ বাঘের পিঠে রাজপুত্তুরকে দেখে তারা বিশ্বাস করে কী করে?

তবু তাদের বিশ্বাস করতে হলো। সব-প্রথম একটি ছোট্ট ছেলে বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায়। আমার পিঠে রাজপুত্তুরকে দেখে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, "মা, বাঘের পিঠে রাজপুত্তুর!" চেঁচাতে চেঁচাতে সে ছুটে এসেছিল রাজপুত্তুরের কাছে। অবাক কথা, বাঘ দেখে সে একটুও ভয় পায়নি! রাজপুত্তুর তাকে আমার পিঠে তুলে নিয়ে আবার বাজনা বাজাতে সুরু করলে। সেই ছোট্ট ছেলেটি আমার পিঠে বসে বাজনার তালে তালে হাততালি দিতে লাগলো।

দেখতে দেখতে চারিদিক থেকে কাতারে কাতারে মানুষ ছুটে এলো। কাতারে কাতারে মানুষ সেই বাজনার তালে তালে নাচতে সুরু করে দিলে। নাচতে নাচতে আমার পিছু পিছু হাঁটা দিলে। আমি দেখতে পেলুম, গোটা শহরটাই যেন আনন্দে উপচে পড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে আর আমার সঙ্গে নেচে নেচে হেঁটে চলেছে।

তারা আমার সঙ্গে রাজবাড়িতেই ফিরে এলো। আবার তারা দেখতে পেয়েছে তাদের রাজাকে। আবার তারা রাজার গলায় মালা পরিয়ে দিলো। রাজাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠলো।

রাজা সিংহাসনে বসলেন। দরবার ডাকলেন। দরবার ডেকে রাজা নিজের গলার মালা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "এ মালা আমার গলায় মানায় না। এ-মালা কেউ যদি পাবার যোগ্য হয়, তো সে শহরের এই রাজা নয়, বনের এই রাজপুত্তুর। এই বাঘই আমাদের শত্রু হুজ্জা-গুজ্জাকে খতম করে, আমাদের সম্মান ফিরিয়ে এনেছে। সুতরাং মালা দিন এই বাঘকে।"

রাজার মুখের কথা শেষ হলো না। বলবো কী, অমন শ'য়ে শ'য়ে মানুষ ফুলের মালা নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দেবার জন্য ছুটে এলো। অতো মালা আমার গলায় ধরবে কোথায়? একজন সিপাই ছুটে এলো আমার কাছে। আমার গলায় একটি-একটি মালা পরিয়ে দিচ্ছে দেশের মানুষ, ও তখন একটি-একটি মালা খুলে নিয়ে পাশে রাখছে। আর কী হাততালি!

শেষে আমি নিজেই ক্লান্ত হয়ে গেছি। যখন মালা দেওয়া শেষ হলো, দেখলুম, দরবার ঘরটা উপচে গেছে ফুলে-ফুলে। আমার বেশ মনে আছে, সব-প্রথম আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল রাজা আর সব শেষে আমায় মালা দিয়েছিল রাজপুত্তুর। শ্বেত গোলাপের গুচ্ছ। ভারি মিষ্টি গন্ধ!

শুনলে অবাক হয়ে যাবে, রাত্রে আমার সম্মানে বসলো, এক বিরাট সভা। কতো মানুষ সেখানে জমায়েৎ হলো। কতো জ্ঞানী-গুণী, কতো গণ্যমান্য। সকলে আমার গুণ-গানে পঞ্চমুখ। আমার এতো তারিফ করতে লাগলো তারা, মনে হলো আমি কী ঠিক অতটা পাবার যোগ্য!

সভার শেষে, আমাকে শোনাবে বলে রাজা নিজেই সেদিন বাজনা ধরলে। সকলে গদগদ হয়ে বাজনা শুনছে আর থেকে থেকে "আহা, উহু, ওহো" করে সভাকে মাতিয়ে রাখছে। আমিও বোকার মতো চেয়ে চেয়ে, তাদের সঙ্গে মনে মনে "উহু উহু" করতে লাগলুম।

কী সুন্দর করে সাজিয়েছে এই সভাটা। কতো ফুল, কতো রঙিন পতাকা। কতো ফানুস উড়ছে আকাশে, কতো আলোর তারা! কেমন সব রঙ-বেরঙের পোষাক পরে সকলে এসেছে! কী রঙের বাহার! কী সুন্দর সুন্দর পোষাক! চোখ ধাঁধিয়ে যায়!

ধাঁধিয়ে গেল সত্যিই। আমার চোখ না, আমার মন। সকলের গায়ে ওই অমন সুন্দর সুন্দর পোষাক দেখে আমার এমন লজ্জা করে উঠলো! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আমার তো গায়ে পোষাক নেই! রঙ চঙে নাই বা হলো, সাদা-মাটাও তো একটা থাকবে! এতো সব রঙ-ঝলমল পোষাক-পরা গণ্যমান্য মানুষের মধ্যিখানে আমি নির্লজ্জের মতো বসে আছি! আমি ন্যাং—

ছিঃ ছিঃ! কী লজ্জা, কী লজ্জা!

Scanned with CamScanner